স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়

চতুর্থ সেমিস্টারে অন্তর্গত এস. ই . সি – টু কোর্সের জন্য উপস্থাপিত

প্রকল্প পত্র :– মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে পৌরানিক প্রভাব

শিক্ষার্থীর নাম : সঙ্গীতা খাটুয়া

সেমিস্টার : চতুর্থ

পত্র : এস. ই . সি – টু

রেজিস্ট্রেশন নম্বর :২১১০৪০২৩৮ ; ২০২১-২২

রোল :৯১১৪৯৫২ নং ২১০০১৮

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

শিক্ষাবর্ষ :২০২২-২০২৩

Phone: 9932873484/7501133806

SWARNAMOYEE JOGENDRANATH MAHAVIDYALAYA

Govt. Aided General Degree College | Estd.: 2014

At+P.O.: Amdabad, P.S.: Nandigram, Dist.: PurbaMedinipur, PIN 721650

www.sjmahavidyalaya.in| Email: sjmahavidyalaya@gmail.com

CERTIFICATE

This is to certify that Sangita Khatua Roll: 1119157 No: 210018, Reg.No:- 2210402238 of 2021 – 22, a student of B.A. 4th Semester (Honours), Bengali Department, Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya for the session 2022-2023; submitted his/her project report for partial fulfillment of the syllabus of SEC-2,(CBCS) prescribed by Vidyasagar University. The project has been prepared under the supervision of Dr. Madhumita Basu and Surajit Mandal and ready to place before examiner for evaluation.

Dr. Ratan Kumar Samanto
Principal
S.J Mahavidyalaya

Principal
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad :: Purba Medinipur :: Pin-721650

Supervisors

Madhumita Basu

Dr. Madhumita Basu
Assistant Professor & HOD
Department of Begali.
S.J Mahavidyalaya

Head of the Department,
Department of Bengali

Surajit Mandal

Surajit Mandal
SACT-I, Department of
Bengali
S.J Mahavidyalaya
Mahavidyalaya

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক প্রভাব

সূচীপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	প্রকল্প বিষয়ক প্রাথমিক আলোচনা	1-2
২	প্রকল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন	3
৩	বিষয় পর্যালোচনা-	4-6
৪	বিষয় আলোচনা	7-17
৫	উপসংহার	18
৬	সিদ্ধান্ত	১৭
৭	গ্রন্থপঞ্জী	২0
৮	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	২1

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্প বিষয়ক সাধারন আলোচনা

ক) প্রকল্প কাকে বলে?

⇒ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সুপরিকল্পিত মূল্যায়নের মাধ্যমে যে কাজ সম্পাদনা করা হয় তাকে প্রকল্প বলে।

খ) প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি কী কী?

⇒ প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি হল —

(i) সমস্যা কেন্দ্রিক: প্রকল্প হল সমস্যা কেন্দ্রিক অর্থাৎ কোনো না কোনো সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

(ii) উদ্দেশ্য ভিত্তিক: কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য করে বা কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

(iii) সৃজনশীলতা: প্রকল্পের কাজের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতা প্রকাশ পায়।

(iv) অভিনবত্ব: প্রকল্পমূলক কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের কাজের মধ্যে অভিনবত্ব দেখা যায়।

(v) অনুসন্ধান মূলক কাজ: প্রকল্প করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা নানা রকমে অনুসন্ধান মূলক কাজের মধ্যে দিয়ে যেতে।

(vi) বাস্তব কেন্দ্রিকতা: প্রকল্প ভিত্তিক কাজ সর্বদা কোনো না কোনো বাস্তব সমস্যাকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে।

(vii) প্রকল্প মূলক কাজের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সমবেদনা, একে অপরের প্রতি নির্ভরশীলতা ইত্যাদি সামাজিক গুনাবলি গুলি বিকাশ -এর হওয়ার সুযোগ গড়ে ওঠে।

(৩) প্রকল্প কত প্রকার হয় এবং কী কী?

⇒ সাধারণত 2 প্রকার হয় যথা – (i) একক প্রকল্প.
(ii) দলগত প্রকল্প.

(৪) প্রকল্প কাজের উদ্দেশ্যগুলি কী কী?

⇒ প্রকল্প কাজের উদ্দেশ্যগুলি হল —

(i) প্রতিটি শিক্ষার্থীকে উৎপাদনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করা. শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাবোধ বাড়া এবং তাদের দলবদ্ধ করা, মানসিক বিকাশ সাধন করা.

(ii) ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সহযোগিতা বোধ জাগিয়ে তোলা

(iii) ছাত্রছাত্রীদের হাতে কলমে কাজ করতে শেখানো

(iv) ছাত্রছাত্রীদের সৃজনশীলতা কাজের প্রতিভাকে সহায়তা করা.

(৫) প্রকল্পমূলক কাজের উপকারিতা কী?

⇒ (i) প্রকল্প রূপায়ণের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়.

(ii) শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগত ভাবে কাজ করার মানসিকতা বৃদ্ধি হবে.

(iii) প্রকল্প রূপায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা পড়ার বই বাইরে গিয়ে বিভিন্ন জ্ঞান অর্জনে সুযোগ পাওয়া যায়.

(৬) প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কী?

⇒ বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক আধুনিক বিশ্বে প্রতিটি দেশের আর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রগতির জন্য প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম. প্রতিটি দেশে এখন আর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সামাজিক অর্থনৈতিক দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে. তারই অংশ হিসেবে উন্নয়ন পরিকল্পনায় সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকে. এবং সেই প্রকল্প সমূহের মাধ্যমে বিকাশ ভিত্তিতে অর্থ বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে জাতীয় উন্নয়নে সহায়তা থাকে.

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রকল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন

আমরা জানি বাংলা সাহিত্যে তিনটি যুগ যথা— (i) প্রাচীন যুগ (ii) মধ্যযুগ (iii) আধুনিক যুগ, তাই মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্য পৌরাণিক প্রভাব দ্বারা অনেকটাই প্রভাবিত হয়েছে। যেমন— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, বৈষ্ণব পদাবলী, অনুবাদ সাহিত্য, শাক্ত পদাবলী, প্রভৃতি প্রতিটি ক্ষেত্রে আমরা পৌরাণিক প্রভাব লক্ষ্য করেছি। শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যে— ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ পুরাণ প্রভৃতি। সংস্কৃত সাহিত্যে হাত ধরেই প্রথম বাংলায় অনুবাদ সাহিত্যের পথ চলা শুরু হয়। রামায়ন, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থগুলি অনুবাদ করে কৃত্তিবাস ওঝা, কাশীরাম দাস, মালাধর বসু প্রমুখ ব্যক্তিরা বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছে। এছাড়াও মঙ্গলকাব্যে বন্দনা অংশ কিংবা দেব খণ্ডে পুরাণের কাহিনী আমরা প্রত্যক্ষ দেখেছি। যেমন দক্ষযজ্ঞ, দক্ষের শিবনিন্দা, দক্ষযজ্ঞ ভঙ্গ, সতীর দেহত্যাগ, গৌরীর জন্ম, হরগৌরীর বিবাহ প্রভৃতি বিষয়গুলি পৌরাণিক কাহিনী থেকে নেওয়া হয়েছে। উক্ত বিষয়গুলি উপর সবিস্তারে আলোকপাত করার জন্য আমি মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক প্রভাব বিষয়টি নির্বাচন করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয় পর্যালোচনা

ভূমিকা—

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হাজার হাজার বছর বা তার বেশি সময়ের ইতিহাস. বাংলা সাহিত্যের এই হাজার বছরের বেশি সময়ের ইতিহাসকে সহজে বোঝার জন্য যুগকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি. যদিও সাহিত্যের ইতিহাসে সন তারিখ দিয়ে স্পষ্ট যুগবিভাগ করা যায় না. সন তারিখ দেখে যুগের শুরু হয় না আর শেষ ও হয় না. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে মোটামুটি তিনটি যুগে ভাগ করা হয়েছে. যথা—

① প্রাচীন যুগ বা আদি যুগ (৭৫০-১২০০ খ্রি.)
② মধ্যযুগ (১২০১-১৮০০ খ্রি.)
③ আধুনিক যুগ (১৮০১ খ্রি. - বর্তমান সময়)

নিম্নে বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ তুলে ধরা হল—

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

- আদি যুগ [৭৫০-১২০০ খ্রি.]
- মধ্য যুগ [১২০১-১৮০০ খ্রি.]
  - প্রাক চৈতন্য যুগ
    - বৈষ্ণব-সাহিত্য
    - মঙ্গলকাব্য
    - অনুবাদ সাহিত্য
  - চৈতন্য যুগ
    - বৈষ্ণব পদাবলি
    - চৈতন্য জীবনী কাব্য
    - অনুবাদ সাহিত্য
    - মঙ্গলকাব্য
  - চৈতন্য পরবর্তী যুগ
    - অন্নদামঙ্গল
    - শাক্ত পদাবলি
    - বাউল গান
- আধুনিক যুগ [১৮০১ খ্রি. - বর্তমান]

আমাদের আলোচ্য বিষয় হল মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে পৌরাণিক প্রভাব. প্রথমে আমরা বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ সম্পর্কে জেনে নেওয়া যাক. যা নিয়ে আলোচনা করা হল—

বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগ: (১২০১-১৮০০ খ্রি.):

বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসে মধ্যযুগের বিস্তার ১২০১ থেকে ১৮০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত. বাংলা সাহিত্যে অন্ধকার যুগ বলে মনে করেন অনেক গবেষকরা ১৩৫০ খ্রি. কারন এই সময় বাংলা সাহিত্যে কোনো নিদর্শন মেলেনি. তাই ১৩৫১ খ্রি. থেকে ১৮০০ পর্যন্ত সময়কে মধ্যযুগ ধরা হয়ে থাকে.

মধ্যযুগকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়- (i) আদি মধ্যযুগ (ii) অন্ত: মধ্যযুগ. আদি যুগে নিদর্শন গুলি মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, [illegible] কৃত্তিবাসের রামায়ন, মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয়, বিজয়গুপ্তের মনসা মঙ্গল কাব্য প্রভৃতি. অন্ত: মধ্যযুগে সাহিত্য নিদর্শন হল- মুকুন্দরাম চক্রবর্তী - চণ্ডীমঙ্গল, বিভিন্ন চৈতন্য জীবনী গ্রন্থ, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, রামপ্রসাদের শাক্তপদাবলি - ইত্যাদি.

বিষয় আলোচনা :

মধ্যযুগের সমাজ পৌরাণিক ও লৌকিক সংস্কৃতি সংমিশ্রণে সৃষ্টি হয়েছিল। তাই সেই যুগের সাহিত্যে পুরাণের প্রভাব থাকাটা কোনো অসম্ভব নয়। বরং তা ছিল স্বাভাবিক। আর্য সংস্কার যখন সমাজের বদ্ধমূলে ছিল তখন তুর্কী আক্রমণ সেই দৃঢ় সংস্কারের মূলে আঘাত হানায় সেই সংস্কার শিথিল হয়ে গিয়েছিল। তবে সেই ফলে অনার্য সংস্কার আর্য সমাজে প্রবেশ পথ পেয়েছিল। ফলে উভয় সংস্কৃতি সংমিশ্রণের ফল হিসেবে আমরা মঙ্গলকাব্যগুলিকে পাই। শুধু তাই নয় আর্য সংস্কৃতিকে মহাবিনাশ হাত থেকে বাঁচাতে একাধিক ও মিশ্রিত রূপে অনুবাদ সাহিত্য ও জীবনী সাহিত্য চর্চা আমরা পেয়েছি। তাই মধ্যযুগে রয়েছে পুরাণ বা পৌরাণিক প্রভাব। তা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হল—

◻ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন :

বাংলা সাহিত্যে রাধাকৃষ্ণ কথার প্রথম আখ্যান কাব্য শ্রীকৃষ্ণকীর্তন। তাই এই গ্রন্থের উপাদান বিভিন্ন গ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। বলা যেতে পারে পৌরাণিক ও লৌকিক উপাদান থেকে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কাহিনী রচনা করেছিলেন কবি। কারণ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যেমন নানান পুরাণ কাহিনী রয়েছে তেমন লৌকিক কথা রয়েছে।

⊕ পৌরাণিক উপাদান :

(ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে জন্মখণ্ডে অন্তর্গত প্রথমে যে সংস্কৃত শ্লোকটির উল্লেখ রয়েছে তা পাওয়া যায় বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ থেকে। শ্লোকটি হল—

" [illegible] কমলাসনে বিষ্ণুনাম / ডঃ সম্মতে
দেবাঃ বস্তুধ্যায়ে মনো দুঃ:"।

(খ) কৃষ্ণ ও নারদ চরিত্রে ভাগবত পুরাণ অনুসারে. তবে বেশ কিছু পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

⑥ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে ভাগবতের বিশিষ্ট প্রভাব পড়েছে বৃন্দাবন খণ্ডে. ভাগবতের কৃষ্ণলীলা সাদৃশ্য হল — কালিয়দমন, বস্ত্রহরণ, রাস,

⑦ শুধু কাহিনী নয়, বিভিন্ন পাত্র পাত্রীর কথার মধ্যে উপমা সিদ্ধান্ত তত্ত্ব ও নানা মিল আবিষ্কারে পৌরাণিক আলোচনার সূত্রপাত করা হয়েছে. যেমন- দান খণ্ডে রাধা কৃষ্ণের হাত থেকে ছাড় পেতে অনেক ভাবে চেষ্টা করেছেন.

রাধা কৃষ্ণকে ভয় দেখিয়ে বলেছেন —

" পুরাণ আগম বেদ করহ বিচার.
দেখ সব পাপ হএ টলকে পরদার".

তার উত্তরে কৃষ্ণ বলেছে —

" পাঁচ পাণ্ডবের হৈলা কুন্তী জননী,
পাঁচ স্বামী যার হৈলে সব লোকে জানী".

বৈষ্ণব পদাবলী :

বিষ্ণু লক্ষ্মীর সত্যেই কৃষ্ণের রাধা. তাই মত বিভিন্ন পুরাণ থেকে পাওয়া যায়. আসলে বিষ্ণুর অবতার না ঈশ্বর রূপে চেতনার বৃদ্ধি কৃষ্ণের লীলা যাদের জন্ম সূত্র থেকে রাধা কৃষ্ণ সম্পর্কের প্রতিষ্ঠা. অন্যদিক থেকে ভাগবত পুরাণে রাধার স্থিতি সূচনা. রাধার উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে বিভিন্ন পুরাণে প্রভাব নিয়ে আলোচনা করা হল —

① শ্রীমদ্ভাগবত — রাসলীলায় কৃষ্ণ যে গোপিকা গোপীকে অন্য সকলকে ত্যাগ করেছিলেন তার উল্লেখ আছে —

" অনয়ারাধিতো নূনং ভগবান হরিরীশ্বরঃ,
যন্নো বিহায় গোবিন্দঃ প্রীতো যামনয়দ্রহঃ".

(২) জয়দেবের গীতগোবিন্দে রাধার উল্লেখ এই ভাবে —

"কংসারিরপি সংসার বাসনাবদ্ধ শৃঙ্খলাম।
রাধামাধায় হৃদয়ে তত্যাজ ব্রজসুন্দরী।"

(৩) সামবেদ-এ স্পষ্টই রাধা মাধবের যুগল মিলনের স্বীকার করা হয়েছে ও বৈষ্ণব আচার্য দ্বারা তা উল্লেখও আছে —

"রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা।"

(৪) নারদ পাঞ্চরাত্র নামক তন্ত্রগ্রন্থে অনুকীর্ত প্রসঙ্গে রাধা তত্ত্ব বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল।

(৫) প্রাচীন পুরাণগুলি থেকে একথা উপলব্ধি করা যায় যে কৃষ্ণের অবতারভূমিতে যেমন রুক্মিণীর গুরুত্ব তেমনি কৃষ্ণের ভাগবত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে রাধার গুরুত্ব দান ও তেমনি হয়েছিল।

চৈতন্যোত্তর যুগে বৈষ্ণব পদাবলীতে বৈষ্ণব কবিদের আদর্শ ছিল ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, সংস্কৃতধর্মী কাব্যে নায়ক-নায়িকার লক্ষণ, সংস্কৃত অলংকার শাস্ত্রের নায়ক নায়িকার বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণের উপস্থাপনা দেখাতে গিয়ে স্বাভাবিক ভাবেই এসেছে কৃষ্ণের লীলাদি

অনুবাদ সাহিত্য :

বিশ্বের অন্যান্য সাহিত্যের মত বিভিন্ন ভাষার সাহিত্য অনুবাদ হয়েছে বাংলা ভাষায়. বাংলা সাহিত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে অনুবাদ সাহিত্য চর্চা হয়েছিল এর মাধ্যমে বাংলা সাহিত্যের উন্নতি ঘটেছিল. বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে কবিরা অনুবাদে হাত দিয়েছিলেন. মোটামুটি তিনটি প্রধান অনুবাদ হয়েছে —

(১) সংস্কৃত থেকে (মহাভারত, রামায়ণ, ভাগবত)
(২) হিন্দি সাহিত্য থেকে
(৩) আরবি ফারসি সাহিত্য থেকে।

মধ্যযুগে কোনো অনুবাদই হুবহু অনুবাদ নয়. কবিরা মূল কাহিনীকে ঠিক রেখে মাঝে মাঝে নিজেদের মতের কথা বসিয়ে দিয়েছেন. অনুবাদ সাহিত্যে হিন্দু লেখকদের অনুবাদকে সাহিত্যের কথা বলা হয়েছে আর মুসলমান লেখকদের অনুবাদকে বলা হয় রোমান্টিক প্রণয় উপাখ্যান. বাংলাদেশে অনুবাদ খ্রিস্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী থেকেই রামায়ণ অনুবাদ সাহিত্যে জনপ্রিয়তা লাভ করে. বিশেষ করে রামায়ণ ও মহাভারত অনুবাদ মধ্যযুগে বাঙালি জীবনকে নতুনভাবে গড়ে তোলে. হিন্দু সমাজের সব শ্রেণির মধ্যে নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতি তথা চেতনা ফিরিয়ে আনতে পৌরাণিক সাহিত্য বিশেষ করে রামায়ণ, মহাভারত প্রচার করেছিলেন. তাই অনুবাদকেরা মহাভারত ও ভাগবত দ্বারা পৌরাণিক সাহিত্যে মূল কাহিনী প্রচারে ব্রতী হয়েছিলেন.

রামায়ণ —: খ্রিস্টপূর্ব চতুর্থ শতকে সংস্কৃত ভাষায়, রামায়ণ রচিত হয়. রামচরিত অবলম্বনে বাল্মীকি সংস্কৃত ভাষায় প্রথম রামায়ণ রচিত হয়. কৃত্তিবাসী রামায়ণ মূল বাল্মীকি রামায়ণের অনুবাদ নয়. বাল্মীকি রামায়ণের সঙ্গে কৃত্তিবাসী রামায়ণ পাঁচালিতে অনেক কাহিনী ও চরিত্রের পার্থক্য রয়েছে. অনেক বাল্মীকি রামায়ণ ছাড়া অন্য কোনো জায়গা থেকে নিয়েছেন সেগুলি হল —

(ক) হরিশ্চন্দ্র উপাখ্যান → দেবী ভাগবত, মার্কণ্ডেয় পুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে.

(খ) ভগীরথের জন্মবৃত্তান্ত → যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ ও পদ্ম পুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে.

(গ) কাণ্ডার মুনি উপাখ্যান → স্কন্দ পুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে.

(ঘ) চণ্ডীকার অকাল বোধনের কাহিনী, কৃত্তিবাস দেবী ভাগবত, বৃহদ্ধর্মপুরাণ ও কালিকা পুরাণ থেকে নেওয়া হয়েছে.

ভালোভাবে দেখলে বোঝা যায় যে কৃত্তিবাস বাল্মিকীর অনেক কাহিনী ইচ্ছামত পরিবর্তন করে নিয়েছেন। কোথাও বা অন্যান্য পুরাণ থেকে সাহায্য নিয়েছেন। যেমন- আদিকাণ্ডে দস্যু রত্নাকর মরা মরা বলে পাপমুক্ত হয়েছিল তা রামায়ণে অযোধ্যা কাণ্ডে এক কাহিনী থেকে নেওয়া যা বাল্মিকী রামায়ণে নেই।

ও সমস্ত বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায় যে, কৃত্তিবাস কোনো কাহিনী সম্পূর্ণ কল্পনায় সৃষ্টি করেছিলেন আবার কিছু পুরাণ থেকে সংগ্রহ করেছে।

মহাভারত:

আজ হতে অন্তত আড়াই হাজার বছর পূর্বে সংস্কৃত ভাষায় মহাভারত রচিত হয়। ইউরোপীয় পণ্ডিতের মতে এ কাব্য খ্রিস্টপূর্ব 200 থেকে 250 অব্দের মধ্যে রচিত। মহাভারতের কাহিনী রামায়ণের পরবর্তী যুগে হলেও মহাভারতের আগে রামায়ণ প্রকাশিত হয়।

মহাভারতের মূল রচয়িতা হলো কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন, বেদ এর ব্যাখ্যা করেছিলেন বলে তার অপর এক নাম বেদব্যাস। রামায়ণের ন্যায় মহাভারত উত্তর ভারতে এবং দক্ষিণ ভারতে পৃথক পৃথক আঞ্চলিক রূপ প্রচলিত ছিল।

কাশীরাম পণ্ডিত কবি ছিলেন। কাশীরাম ব্যাসদেবের মূল সংস্কৃত মহাভারতের বেশ কিছু অংশ গ্রহণ করেছে আবার কিছু অংশ বর্জন ও করেছেন। সংস্কৃত মহাভারত ছাড়া নানা পুরাণ ও উপপুরাণ থেকে কাশীরাম তার কাব্যে কাহিনী উপাদান সংগ্রহ করেছেন।

কাশীরাম যে সংস্কৃত পণ্ডিত ছিলেন তার বহু প্রমাণ ব্যাসদেবের মহাভারতের সঙ্গে যথেষ্ট যোগাযোগ মিলে দেখা যায় তার কাব্যে। সংস্কৃত ভালো না জানলে কাশীরাম ভালোভাবে ব্যাসদেবের মহাভারত শুদ্ধ অনুবাদ করতে পারতেন না যেমন ——

ব্যাসদেবের মহাভারত :- " অর্থানামর্জনে দুঃখং বর্জনে
রক্ষণে তথা,
তস্মাৎ হি বৈরিণো জাতি
বহিঃ উদ্ধার পারিবে।।"

কাশীরাম দাসের মহাভারত :- " উপার্জনে যত কষ্ট
ততেক পালনে।
ব্যয়ে হয় যত দুঃখ মরণে
দ্বিগুণ।।
অর্থ যার আছে তার সদা
ভীত মন,
তার বৈরী রাজা অগ্নি
চোর বন্ধুজন।।"

ভাগবত :

ভাগবত কাব্যে ধর্মে রচিত. হিন্দু ধর্মের এই পবিত্র ধর্মগ্রন্থটি বাংলায় অনুবাদ করেন মালাধর বসু. এজন্য তিনি বাদশাহ রুকনউদ্দিন বরবক শাহের কাছ থেকে 'গুণরাজ খান' উপাধি লাভ করেন. তার ভাগবতের নাম 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়'.

সংস্কৃত ভাষায় রচিত ভাগবত বৈষ্ণব সম্প্রদায় কাছে খুবই পবিত্র গ্রন্থ. এটি পুরাণ নামক সংস্কৃত সাহিত্যের অন্তর্গত. পুরাণে পাঁচটি লক্ষণ — সর্গ, প্রতি-সর্গ, বংশ, মন্বন্তর ও বংশানুচরিত, অর্থাৎ, সৃষ্টিতত্ত্ব, প্রলয়ের পরবর্তী সৃষ্টি কাহিনী, দেব শত্রুর জন্মবৃত্তান্ত, মনুর অধিকার কাল হিসেবে যুগবিভাগ, রাজাদের বংশ কাহিনী, কৃষ্ণের জন্ম বাল্য, কৈশোর এবং দেহত্যাগ কথা বর্ণিত হয়েছে এই গ্রন্থে.

মালাধর বসু ভাগবত অনুবাদের ক্ষেত্রে স্বাধীনতা নিয়েছেন. ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্দে শ্রীকৃষ্ণের মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়েছে. ভাগবতের দশম স্কন্দে শ্রীকৃষ্ণ জন্ম থেকে দ্বারকালীলা বর্ণিত হয়েছে. কাব্য রচনার কারন সম্বন্ধে কবি বলেছেন—

" ভাগবত অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে গাহি পাঁচালি রচিয়া॥
ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি।
তেকারণে ভাগবত গীত ছন্দে গাহি॥"

মালাধর বসু ভাগবত বহির্ভূত বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশ পুরাণ কাহিনী অনুসরণে বৃন্দাবন লীলা, রাসলীলা, দান লীলা ও নৌকালীলা এনে অন্তর্ভুক্ত মালাধরের কাব্য গোবিন্দ বিজয় বা গোবিন্দ মঙ্গল নামে খ্যাত.

মালাধর বসু তাঁর কাব্যে তিনটি ধারায় বিন্যাস করেছেন — বৃন্দাবনলীলা, মথুরালীলা, দ্বারকালীলা. বৃন্দাবনলীলায় রয়েছে দৈত্যের টানে ভক্ত বৈকুণ্ঠের বিষ্ণুর বৃন্দাবনে কৃষ্ণরূপে আবির্ভাব থেকে মথুরাযাত্রা. অন্যদিকে মথুরা লীলায় রয়েছে কংসের নিধন থেকে দ্বারকায় জল দুর্গ নির্মান উদ্যোগ. এবং দ্বারকালীলা রয়েছে দ্বারকাপুরী নির্মান থেকে কৃষ্ণের অন্তর্ধান পর্যন্ত কাহিনী বর্ণনা রয়েছে. তাই মালাধর বসু ভাগবতের শুধু অনুবাদ করেননি কিছুটা মনের ভাব ও প্রকাশ করেছেন.

শাক্ত পদাবলি :

মধ্যযুগের শেষের দিকে অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বাংলা সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ হল 'শাক্ত পদাবলি'। আমাদের পাগল বাঙালি মায়ের আরাধনার স্বরূপ শাক্ত পদাবলিতে কাব্য রূপ লাভ করেছে। শাক্ত সাধকেরা জগৎ জননীকে ঘরের মেয়ে রূপে ভজনা করেছেন। আবার তারা কখনো সন্তান রূপে অভিযোগ, অনুযোগ করে মায়ের চরণে আশ্রয় নিয়েছেন। বিশেষ করে রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত শাক্ত সাহিত্যকে এক মহান মহিমায় গড়ে তুলেছেন. চামুণ্ডা তন্ত্রে এই শাক্ত দেবীর দশটি রূপের কথা বলা হয়েছে।

দেবীভাগবত, কালিকাপুরাণ ও মার্কণ্ডেয় চণ্ডী এবং ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণগুলিতে দেবী সম্পর্কে যে সবিশেষ কাহিনী পাওয়া যায়, শাক্ত সঙ্গীতের আখ্যান ভাগ তার দ্বারা প্রভাবিত, দক্ষযজ্ঞে সতীর দেহত্যাগ. উমারূপে হিমরাজ গৃহে তার জন্ম, ইন্দ্রের বজ্র থেকে মৈনাক পর্বতের সমুদ্রে আশ্রয় গ্রহণ, দেবীর কালী প্রতিমা প্রভৃতি বহু পৌরাণিক প্রসঙ্গ শাক্ত সঙ্গীতের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

শ্রী শ্রী চণ্ডীতে দেবীকে যে ঐশ্বর্য ও মাধুর্যময়ী রূপে বর্ণনা, শাক্তপদাবলির মায়ের রূপ ও বিশুদ্ধতা প্রভৃতি তার সামঞ্জস্য বিদ্যমান। দেবী ভাগবতের পুরাণ কাহিনী শাক্ত পদাবলিতে গৃহীত হয়েছে, পর্বত রাজ হিমালয় এবং তার স্ত্রী মেনকা সু-কঠিন তপস্যা করে জগৎ জননীকে তুষ্ট করেছিলেন, তাদের ভক্তি দেখে দেবী তাদের ঘরে কন্যা রূপে জন্ম গ্রহণ হবে বলে অঙ্গীকার করেছিলেন. ভাগবত গীতার প্রথম অধ্যায়ে বলা হয়েছে —

"ত্রৈলোক্য জননী দুর্গা অন্নরূপে সনাতনী,
অম্বিকা গিরিরাজের তব সদা মেনকা নন্দিনী"

এভাবে যিনি পূর্ণ অন্নপূর্ণা তিনি স্নেহের টানে জন্ম হলেন, কন্যা উমারূপে মাতৃ জননীর কোলে। পুরাণে চৈতন্য মালিনী পরমা প্রকৃতি এখানে ঘরের মেয়ে, পশুপতি যোগীশ্বর মহাদেব ঘরের জামাই।

মঙ্গল কাব্য :-

ত্রিশ্রীয় ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত রচিত বাংলা কাব্যের একটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা হল মঙ্গলকাব্য। এটি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে এক বিশেষ ধারা, মানুষের কল্যাণ বা মঙ্গলের জন্য পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনি অবলম্বনে এই কাব্যগুলি রচিত হয়েছিল। হিন্দু পৌরাণিক বিশ্বাসের সাথে এ কাহিনীর সংযোগ রয়েছে। মঙ্গলকাব্য রচনার সাথে গভীর সম্পর্ক রয়েছে। সেকালে ধর্মীয় বিশ্বাস রাজনীতি, ভৌগোলিক আর্থসামাজিক অবস্থা ও কাব্যধর্মী উপস্থাপন ধারনা।

তুর্কি আক্রমণের ফলে সমাজে যখন বর্ণ সংঘাতের প্রয়োজন দেখা দিল তখন সামাজিক সংকটের ফলে বাংলা সাহিত্য দুভাগে ভাগ হয়ে যায়। একদিকে বাঙালি নিজস্ব লৌকিক ধর্ম ও আখ্যায়িকাগুলি মঙ্গলকাব্য রূপে বিকাশ লাভ করে। অন্যদিকে সংস্কৃতের অনুসৃতি — ভাগবত, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতির কথা অনুবাদ হতে লাগল। সেদিক থেকে মঙ্গলকাব্য আবার আবৃত্তি দেব দেবীর স্তুতি থেকে পৌরাণিক প্রভাব সবচেয়ে বেশি।

প্রতিটি মঙ্গলকাব্যে একাধিক দেব দেবীর কথা বর্ণিত হয়েছে। এর লৌকিক দেবতার সঙ্গে পৌরাণিক দেবতার সমন্বয়ে সৃষ্টি হয়েছে বাঙালি নিজস্ব দেবতা। মঙ্গলকাব্যে প্রধান দেবতা হচ্ছেন মনসা, চণ্ডী, ও ধর্মঠাকুর। এদের মধ্যে মনসা ও চণ্ডী এই দুই স্ত্রী দেবতা প্রাধান্য বেশি। এই তিনজনকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে মনসামঙ্গল, চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল। এদের সাথে শিবঠাকুর ও মঙ্গলকাব্যে বিষয় হিসেবে যুক্ত হয়েছেন এবং তার নাম হয়েছে শিবায়ন বা শিবমঙ্গল।

ভারতচন্দ্র ছিলেন অষ্টাদশ শতকের শ্রেষ্ঠ কবি এবং তার এক অমর শ্রেষ্ঠ কাব্য হল অন্নদামঙ্গল। অন্নদামঙ্গলের প্রথম উপাখ্যানে মূল ঘটনা হল পৌরাণিক। এতে সতীর দেহত্যাগ, পার্বতীর বিবাহ, শিবের সংসার ও কাশীতে দেবীর অন্নপূর্ণা মূর্তি ধারণে বর্ণনা রয়েছে। সে সঙ্গে আরো আছে হরিহরের দ্বন্দ্ব ছেড়ে দেবী

কীভাবে রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পূর্বপুরুষ ভবানন্দ নদিয়ায় উপনিবেশের বর্ণনা করা হয়েছে।

শিবায়ন বা শিবমঙ্গল মৌলিক কাব্য নয়। শিব চরিত্রকে কোন ধারার মঙ্গল কাব্যের মধ্যে প্রত্যেক মঙ্গল এক অনিবার্য আসন রয়েছে। প্রচলিত সমস্ত লৌকিক ও পৌরাণিক কাহিনী সংগ্রহ করে একটি নমুনা গ্রন্থ তৈরি হয় যা পরবর্তীকালে শিবায়ন বা শিবমঙ্গল নামে পরিচিত।

শিবায়ন ধারার প্রথম কবি রামকৃষ্ণ রায় সপ্তদশ শতকে প্রথম পাদে তার কাব্য রচনা করেন। মঙ্গল কাব্য রচনায় প্রচলিত আছে যে স্বপ্নাদেশে তার কাব্য রচিত হয়েছে তা উল্লেখিত আছে —

" ভক্তি দিলেন উক্তি নহে মোর নিজ শক্তি
স্বপ্নের ইঙ্গিত অনুক্রমে।"

শিবায়ন ধারা প্রধানত পৌরাণিক শিবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন - দক্ষকন্যা সতীর সঙ্গে মহাদেবের বিবাহ, দক্ষ জামাতাকে দক্ষের দেব সভায় মর্যাদা না দেওয়া, পিতার শিবহীন যজ্ঞে সতীর দশমহাবিদ্যার রূপ দেখিয়ে বিনা নিমন্ত্রণে পিতৃগৃহে গিয়ে স্বামীনিন্দা শুনে দেহত্যাগ, সতী পার্বতী রূপে জন্ম, তারপর তপস্যা, মদনভস্ম, হর-পার্বতীর বিবাহ প্রভৃতি অংশের মধ্যে পৌরাণিক প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়।

উপসংহার:-

সুতরাং, মধ্যযুগে বিভিন্ন সাহিত্যে পুরাণ বা পৌরাণিক -এর প্রসঙ্গ নানান ভাবে ব্যক্ত হয়েছে। আসলে পাঠকরা বিশেষ শ্রোতাদের রুচি ছিল পুরাণ চর্চা, তাই কবিগণ সেই চাহিদাকে প্রত্যাখ্যান করতে পারেননি। শুধু তাই নয় মধ্যযুগে বহু কবি ছিলেন আত্মজ্ঞ ও পান্ডিত তাই তাদের আত্মধারায় ও পান্ডিত্যের সূত্রে পুরাণ কথা বা পৌরাণিক উপাদান তাদের কাব্যে উপস্থিত থাকবে তা বলাবাহুল্য।

সিদ্ধান্ত

দীর্ঘ আলোচনা পর আমি দেখলাম যে মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে কেবলমাত্র লৌকিক ভাবনা নয় অন্যান্য পৌরাণিক প্রভাব ও রয়েছে। মধ্যযুগে উল্লেখযোগ্য আদ্য মঙ্গলকাব্য থেকে শুরু করে বৈষ্ণব পদাবলী, অনুবাদ সাহিত্য জীবনী সাহিত্য, শাক্ত পদাবলী প্রভৃতি সাহিত্যে পৌরাণিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যেমন- শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যে ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশপুরাণ প্রভৃতি উপাদানে সমৃদ্ধ। মঙ্গলকাব্যে বন্দনা অংশে দেবখণ্ডে অন্যান্য পুরাণের কাহিনী লক্ষ্য করি, যেমন- সতীর দেহত্যাগ, দক্ষযজ্ঞ, শিবনিন্দা প্রভৃতি এছাড়া ও রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত প্রভৃতি গ্রন্থে পৌরাণিকতা প্রভাব দেখা যায়। অতএব আমরা বলতে পারি মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে লৌকিক প্রভাব ও যেমন ছিল তেমনি পৌরাণিক প্রভাব ও ছিল।

গ্রন্থপঞ্জী

(i) আধুনিক বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস → তপনকুমার চট্টোপাধ্যায় → চতুর্থ সংস্করণ (2011 আগস্ট).

(ii) বাংলা সাহিত্য ও সাহিত্যটীকা → তুলসী প্রকাশনী → ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় → সপ্তম সংস্করণ (2011 আগস্ট).

(iii) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড) → মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড → অসিত কুমার বন্দোপাধ্যায় → পুনর্মুদ্রণ (2015-2016)

(iv) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস → ড. দেবেশ কুমার আচার্য → 20/1 কলেজ রো → পঞ্চম মুদ্রণ (আগস্ট 2016)

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এই প্রকল্পমূলক কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়ে যেসব ব্যক্তি সহযোগিতা ও পরামর্শের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সমস্ত গ্রন্থাগারকে যেখান থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন গ্রন্থ ও পত্রিকা আমার প্রকল্প রচনার জন্য সাহায্য করেছে। তাছাড়াও সুনামধন্য যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সুরজিৎ মণ্ডল ও শ্রীযুক্ত দীপঙ্কর সরকার এবং অধ্যাপিকা শ্রীমতী অস্মিতা বসু তাদের পরামর্শ, নির্দেশনা ও সহযোগিতায় আমার এই অনুসন্ধানমূলক কাজটি সফল হয়েছে। তাই তাদের প্রতি ও আমি চিরকৃতজ্ঞ।

DA

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

EXAMINED
External 2/2/23

সঙ্গীতা ঘোষ
শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

তত্ত্বাবধায়ক / শিক্ষকের স্বাক্ষর

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়

চতুর্থ সেমিস্টারের অন্তর্গত এস ই সি -টু কোর্সের জন্য উপস্থাপিত

প্রকল্প পত্র :-মধ্য যুগের রামায়ণ মহাভারত এবং ভাগবত অনুবাদের প্রাসঙ্গিকতা

শিক্ষার্থীর নাম :- চন্দনা খাটুয়া

সেমিস্টার :-চতুর্থ

পত্র -এস ই সি -টু

রেজিস্ট্রেশন নং -২১১০৪০২০১,২০২১-২০২২

রোল নং :-১১১৪১৫২-২১০০০৫

শিক্ষাবর্ষ :২০২২-২০২৩

Phone: 9932873484/7501133806

SWARNAMOYEE JOGENDRANATH MAHAVIDYALAYA

Govt. Aided General Degree College | Estd.: 2014
At+P.O.: Amdabad, P.S.: Nandigram, Dist.: PurbaMedinipur, PIN 721650
www.sjmahavidyalaya.in| Email: sjmahavidyalaya@gmail.com

CERTIFICATE

This is to certify that Chandana Khatua Roll: 1114152 No: 210005, Reg. No.- 211040201 of 2021 - 2022, a student of B.A. 4th Semester (Honours), Bengali Department, Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya for the session 2022-2023; submitted his/her project report for partial fulfillment of the syllabus of SEC-2,(CBCS) prescribed by Vidyasagar University. The project has been prepared under the supervision of Dr. Madhumita Basu and Surajit Mandal and ready to place before examiner for evaluation.

Supervisors

Dr. Ratan Kumar Samanta
Principal
S.J Mahavidyalaya

Principal
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad :: Purba Medinipur :: Pin-721650

Dr. Madhumita Basu
Assistant Professor & HOD
Department of Begali.
S.J Mahavidyalaya

Head of the Department,
Department of Bengali
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad, P.S.- Nandigram, Purba Medinipur, Pin-721650

Surajit Mandal
SACT-I, Department of Bengali
S.J Mahavidyalaya
Mahavidyalaya

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

: সূচিপত্র :

অধ্যায়	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
প্রথম অধ্যায়	প্রকল্প বিষয়ক সাধারণ আলোচনা	১ - ৩
দ্বিতীয় অধ্যায়	বিষয়বস্তু নির্বাচন	৪
তৃতীয় অধ্যায়	বিষয় পর্যালোচনা	৫ - ২২
চতুর্থ অধ্যায়	সিদ্ধান্ত	২৩
	গ্রন্থপঞ্জী	২৪
	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	২৫

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

প্রথম অধ্যায়

ক) প্রকল্প কাকে বলে?

⇒ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সুপরিকল্পিত মূল্যায়নের মাধ্যমে যে কাজ সম্পাদনা করা হয় তাকে প্রকল্প বলা হয়।

খ) প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য গুলি কী কী?

⇒ প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য গুলি হল ——

(i) সমস্যা কেন্দ্রিক: প্রকল্প হল সমস্যা কেন্দ্রিক অর্থাৎ কোনো না কোনো সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

(ii) উদ্দেশ্য ভিত্তিক: কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য করে বা কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

(iii) সৃজনশীলতা: প্রকল্পের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটে।

(iv) অভিনবত্ব: প্রকল্প মূলক কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের কাজের মধ্যে অভিনবত্ব দেখা যায়।

(v) অনুসন্ধান মূলক কাজ: প্রকল্প করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা নানা রকমের অনুসন্ধানমূলক কাজের মধ্য দিয়ে শেখে।

(vi) বাস্তব কেন্দ্রিকতা: প্রকল্প ভিত্তিক কাজ সর্বদা কোনো না কোনো বাস্তব সমস্যাকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে,

(vii) প্রকল্প মূলক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে সহযোগীতা, সহমর্মিতা, সমবেদনা, একে অপরের প্রতি নির্ভরশীলতা ইত্যাদি সামাজিক গুনাবলী গুলি বিকশিত হওয়ার সুযোগ গড়ে ওঠে।

(গ) প্রকল্প কয়প্রকার ও কী কী?

⇒ প্রকল্প সাধারনত ২ প্রকার হয়, যথা —

(i) একক প্রকল্প,

(ii) দলগত প্রকল্প,

(ঘ) প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি কী কী?

⇒ প্রকল্পের উদ্দেশ্য গুলি হল —

(i) প্রতিটি শিক্ষার্থীকে উৎপাদনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করা, শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাবোধ করা এবং তাদের দলবদ্ধ করা, মানসিক বিকাশ সাধন করা,

(ii) শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা বৃদ্ধি হবে।

(iii) প্রকল্প রূপায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা সেতার বইয়ের বাইরে গিয়ে নিজস্ব জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়।

প্রকল্প মূলক কাজের উপকারিতা:

① প্রকল্প রূপায়নের মধ্যদিয়ে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

② শিক্ষার্থীদের মধ্যে পড়ার বইয়ের বাইরে গিয়ে নিজস্ব জ্ঞান অর্জনে সুযোগ পাওয়া যায়।

প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা:

বর্তমানে প্রতিযোগীতা মূলক আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রগতির জন্য প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রতিটি দেশে এমন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সামগ্রিক অর্থনীতির দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে, তারই অংশ হিসেবে উন্নয়ন পরিকল্পনার সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহণ করা হয়ে থাকে। এবং সেই প্রকল্প সমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পদ বিনিয়োগ করা হয় যাতে জাতীয় উন্নয়ন অব্যাহত থাকে।

মধ্যযুগে রামায়ন, মহাভারত এবং ভাগবত অনুবাদের প্রাসঙ্গিকতা

অনুবাদ সাহিত্য

অনুবাদ কথার অর্থ হল ভাষান্তর। অর্থাৎ কোনো ভাষাকে এক ভাষা থেকে অন্য ভাষায় রূপান্তরিত করাকে অনুবাদ বলা হয়।

বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ দুই প্রকার, যথা —
(i) আক্ষরিক অনুবাদ,
(ii) ভাবানুবাদ।

(i) **আক্ষরিক অনুবাদ** : অনুবাদক যখন প্রতিটি বাক্যের প্রতিটি শব্দের হুবহু অনুবাদ করে তখন তাকে আক্ষরিক অনুবাদ বলা হয়।

(ii) **ভাবানুবাদ** : অনুবাদক যখন মূল বিষয়কে ঠিক রেখে নতুনভাবে বাক্য তৈরী করেন তখন তাকে ভাবানুবাদ বলা হয়।

অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা :

(i) কোনো এক ভাষার গল্প, উপন্যাস, ইতিহাস, বিজ্ঞান প্রভৃতি অন্যভাষী মানুষের উপযোগী করে তোলার জন্য অনুবাদের প্রয়োজন।

(ii) অনুবাদের মাধ্যমে পুরো পৃথিবীর সাহিত্য, সংস্কৃতি ও বিজ্ঞান সম্পর্কে আমরা জ্ঞান লাভ করতে পারি।

(iii) কোনো ভাষার গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য, মনের ভাব, প্রয়োজনীয় তথ্য অন্যভাষী মানুষদের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য অনুবাদ প্রয়োজন।

অনুবাদের বৈশিষ্ট্য :

(i) অনুবাদ হল একবিষয়ের জিনিস। এর ভাব ও ভাষারি মধ্যে মিল থাকতে হবে।

(ii) অনুবাদের বিষয়টি বার বার পড়ে মূল বিষয় ভালোভাবে বুঝে নিতে হবে।

(iii) অনুবাদ করার সময় কঠিন ভাষা ব্যবহার না করে সহজ- সরল ভাষা ব্যবহার করতে হবে।

(iv) অনুবাদ করার সময় মূল বিষয়কে ঠিক রেখে অনুবাদ করতে হবে।

(v) ভাষার সৌন্দর্য রক্ষার জন্য বড়ো বড়ো বাক্যকে ভেঙে ছোটো ছোটো বাক্যে অনুবাদ করতে হবে।

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদের ধারা:

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

- আদিযুগ (৭৫০ - ১২০০ খ্রিঃ)
- মধ্যযুগ (১২০১ - ১৮০০ খ্রিঃ)
  - প্রাক-চৈতন্য যুগ
    - বৈষ্ণব সাহিত্য
    - মঙ্গলকাব্য
    - অনুবাদ সাহিত্য
  - চৈতন্যযুগ
    - বৈষ্ণব পদাবলী
    - চৈতন্য জীবনীকাব্য
    - অনুবাদ সাহিত্য
    - মঙ্গলকাব্য
  - চৈতন্য পরবর্তী যুগ
    - অন্নদামঙ্গল
    - শাক্তপদাবলী
    - বাউলগান
    - [illegible]
- আধুনিক যুগ (১৮০১ খ্রিঃ - বর্তমান সময়)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছর বা তার চেয়েও বেশি সময়ের ইতিহাস। বাংলা সাহিত্যে এই হাজার বছরের বেশি সময়ের ইতিহাসকে মনে রাখার ক্ষেত্রে যুগকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করতে পারি। যদিও সাহিত্যের ইতিহাসে সব সময় সাল - তারিখের হিসাবে সময় যুগবিভাগ করা যায় না, বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রবীনত তিনভাগে ভাগ করা হয়েছে —

(i) প্রাচীন যুগ বা আদিযুগ [৭৫০ - ১২০০]
(ii) মধ্যযুগ [১২০১ - ১৮০০ খ্রিঃ]
(iii) আধুনিক যুগ। [১৮০১ - বর্তমান সময়]

এখানে আমার আলোচ্য বিষয় হল — মধ্যযুগে রামায়ন, মহাভারত এবং ভাগবত অনুবাদের প্রাসঙ্গিকতা।

মধ্যযুগে রামায়ন, মহাভারত এবং ভাগবত অনুবাদের প্রাসঙ্গিকতা

অনুবাদ সাহিত্যের প্রধান তিনটি ধারা।

যথা — (i) রামায়ন,

(ii) মহাভারত।

(iii) ভাগবত।

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে যেসব সাহিত্য রচনা হয়েছিল তার মধ্যে গুরুত্বপূর্ন হল অনুবাদ সাহিত্য, মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ সাহিত্য এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। রামায়ন, মহাভারত এবং ভাগবত অনুবাদ করে বাঙালী কবিরা বিশেষ কৃতিত্ব অর্জন করেছেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে রামায়ন, মহাভারত এবং ভাগবতের যেসব ভাবানুবাদ প্রচার হয়েছিল তার থেকে বোঝা যায় কাশীরাম দাসের রামায়ন ও মহাভারতের অনুবাদগুলি বিশেষভাবে প্রচার হয়েছিল, বিশেষত, মহাভারতের অনুবাদক কাশীরাম দাস কাহিনী ও রসকে বাঙালী জীবনে পরিবেশন করে কৃত্তিবাসের সমান অক্ষয় মহিমা লাভ করেছেন। অবশ্য মধ্যযুগে রামায়ন ও মহাভারত পাঁচালী গান আকারে অশিক্ষিত সমাজে পরিবেশন করা হত। কিন্তু একথা সত্য যে অনুবাদ সাহিত্য থেকে কাশীরাম দাসকে বাদ দিলে তা অসম্পূর্নই থেকে যাবে।

কিন্তু পুরানীকরনের দ্বারা মহাভারত ও রামায়ন অনুশীলনের মাধ্যমে বাঙালীর মনের প্রকৃতি বদলে দিয়েছিল তাতে কোনো সন্দেহ নাই এবং সেই পুরান ঐতিহ্য মঙ্গলকাব্যের প্রাচীন ধারাকে কখনো প্রত্যক্ষভাবে আবার কখনো পরোক্ষভাবে নতুন জীবন দান করেছিল। কিন্তু তখন বৈষ্ণব ভাবপ্রবাহ দেশের সমস্ত মাটিকে আবেগের রসে আদ্র করে রেখেছিল। এই সমস্ত কারনে সপ্তদশ শতাব্দীতে বহু অনুবাদকের আবির্ভাব হলেও দুই একজনকে বাদ দিয়ে কেউ তেমন কবি প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেনি। অবশ্য দুই একজন বাঙালী অনুবাদক বাঙালীর জীবনকে পৌরানিক প্রভাবের মাধ্যমে দৃঢ়ভাবে সংরক্ষন করেছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীতে অনুবাদ সাহিত্য বাঙালীর ধর্মকে কতদূর প্রভাবিত করতে পেরেছে তা রামায়ন, মহাভারত এবং ভাগবতের সংক্ষিপ্ত আলোচনা করলে বোঝা যাবে।

সামাজিক প্রেক্ষাপট :

মধ্যযুগে বাংলাদেশে ১২০৬ খ্রিঃ যে তুর্কী আক্রমন হয়েছিল তাতে বাংলাদেশের সমাজ এক সমস্যার মুখে পড়ে। তখন বাঙালী জীবন একদিকে বাঁচবার প্রার্থনা অন্যদিকে প্রানরক্ষার তাগিদ, মধ্যযুগে সাধারন মানুষের সবচেয়ে বড়ো চাওয়া হল, সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকা ও নিজ নিজ ধর্মে ও কর্মে মনস্থির করা এই সুন্দর জীবন যাপনে যখন বাধা আসে তখন সাধারন মানুষের মধ্যে এক ভয়াবহ আকাঙ্ক্ষা দেখা দেয়।

ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে ষোড়শ শতাব্দী পর্যন্ত আমরা মধ্যযুগের একটি স্থূল কালসীমা নিরূপন করতে পারি, যার আদিতে আছে সেন বংশের শাসন কালের শেষ সীমা এবং অন্যদিকে চৈতন্যদেবের আবির্ভাব।

মধ্যযুগে বাংলা অনুবাদ সাহিত্য থেকে বাঙালির হৃদয় চেতনার স্বরূপ নির্ণয়ের আগে আমাদের যুগ চেতনার স্বরূপ জেনে রাখা প্রয়োজন।

লক্ষ্মণ সেনের সভাকে কেন্দ্র করে সংস্কৃত কাব্য সাহিত্যের মন্থন, পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছিল, তখন ইসলাম ধর্মের কিছু তুর্কী যারা পর্বতে বসবাস করত তারা বাংলাদেশ দখল করে ফেলল। খ্রিস্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় দুশো বছর ধরে এই ইসলামদের রাজত্ব ছিল। একে 'বঙ্গ সংস্কৃতির তামস যুগ' (The dark age) বলা হয়।

চৈতন্য আবির্ভাব ও হোসেন শাহী আমলের মাধ্যমে এই তামস যুগ নতুন জীবনের আলোর রেখায় পরিবর্তিত হল, মধ্যযুগের বাঙালী বিভিন্ন প্রতিকূলতা বহিরাক্রমণ সংবাদ ও বিভিন্ন অত্যাচারের মধ্যে ও আলোর সাধনা করেছে। মধ্যযুগে অনুবাদ সাহিত্যের মধ্যে এইসব ইতিকথা আমরা জানতে পারব। অনুবাদ সাহিত্য গড়ে উঠেছে মহাভারত, রামায়ণ এবং ভাগবত অবলম্বন করে।

মধ্যযুগে প্রবীনত ছিল বহিরাক্রমনের যুগ। এইসময় বাংলাদেশের জনজীবন বিপদে ছিল। বাংলাদেশের মানুষ তখন নিজেদের প্রান বাঁচানোর চেষ্টা করে। তখন প্রত্যেকের একটাই প্রার্থনা ছিল ——————

'মরিতে চাহি না আমি সুন্দর ভুবনে।'

বাংলাদেশে বল্লাল সেন যে কৌলিন্য প্রথা প্রচলন করেছিলেন তাতে বাংলাদেশে হিন্দুসমাজে বিভিন্ন জাতিভেদ সমস্যা দেখা দেয় বিভিন্ন ধরনের প্রথার ফলে হিন্দুসমাজ ক্রমশ বিপর্যয়ের দিকে এগিয়ে যায়। তুর্কী সেনার আক্রমনে বিপর্যয় আরো বিশাল আকার ধারন করতে থাকে। তুর্কী সেনারা বাংলাদেশে অত্যাচার, ধনসম্পদ লুন্ঠন ও হত্যাকান্ড চালিয়ে যায়। প্রানভয়ে কিছু বাঙালীরা ভয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন। উচ্চ শ্রেনীর মানুষদের ঘৃনা ও অবজ্ঞা থেকে বাঁচবার জন্য নিম্নশ্রেনীর মানুষেরা স্বেচ্ছায় ইসলাম ধর্ম গ্রহন করেন। মুসলীম শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়ায় দেশে শান্তি শৃঙ্খলা ফিরে এলো। হিন্দু সমাজের এই বিপর্যয় দেখে হিন্দু দলপতিরা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। হিন্দু দলপতিরা ঠিক করলেন যে উচ্চশ্রেনীর মানুষদের মধ্যে ঐক্য বন্ধন ঘটাতে হবে তাতেই এই বিপর্যয় থেকে মুক্তি পাওয়া যাবে।

সংস্কৃতি সমন্বয়ের মনোভাব :

সমাজের উচ্চশ্রেণীর মানুষেরা নিম্নশ্রেণীর মানুষদের অবজ্ঞা না করে কাছে টেনে নিলেন। এতকাল উচ্চশ্রেণীর মানুষদের বিভিন্ন শাস্ত্রচর্চার অধিকার ছিল এবং নিম্নশ্রেণীর মানুষেরা এই অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। তুর্কী আক্রমনের ফলে অভিজাত সম্প্রদায়ের মানুষেরা বুঝতে পারলেন যে, হিন্দুসমাজকে এই বিপদ থেকে বাঁচাতে গেলে সর্বপ্রথম পুরানের হিন্দু ধর্মের কথা সাধারন মানুষের মধ্যে প্রচার করতে হবে, এর ফলে হিন্দুসমাজ জাতিভেদ সমস্যা থেকে মুক্তি পাবে, পৌরানিক আদর্শ সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করলে জ্ঞানহীন নিম্ন-শ্রেণীর মানুষেরা ইসলাম 'ধর্ম' গ্রহন করবে না,

সাহিত্য ও সংস্কৃত চর্চার মাধ্যমে হিন্দুসমাজের আত্মিক মিলনের সূত্রপাত হল, এর ফলে দেখা দিল অনুবাদ সাহিত্যের ব্যাপক চাহিদা। সংস্কৃত সম্পর্কে শিক্ষিত ও অল্পশিক্ষিত বাঙালীর কাছে শিক্ষিত অভিজাত শ্রেণীর কবিরা পুরান অনুবাদ করে তাঁদের ধর্ম নিম্নশ্রেণীর মানুষদের কাছে পৌঁছে দিলেন। তারপর বাংলা সাহিত্যে রামায়ন, মহাভারত. এবং ভাগবত প্রভৃতি পৌরানিক গ্রন্থকে বাংলায় অনুবাদ করা হল,

রামায়নের অনুবাদ :

মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট নিদর্শন আদি কবি বাল্মীকি রচিত সংস্কৃত মহাকাব্যের অনুবাদ। কবি কৃত্তিবাস এই সংস্কৃত রামায়নের আদি অনুবাদক। তিনিই প্রথম উত্তর ভারতে রামায়ন অনুবাদের পথিকৃৎ। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের নাম শ্রীরাম পাঁচালী। বড় চণ্ডীদাসের পরে তিনি বাংলা সাহিত্যের উল্লেখযোগ্য কবি।

রামায়নের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য অনুবাদক ও তাদের কাব্যের নাম নিম্নে তুলে ধরা হল—

	সময়কাল	কবি	কাব্যের নাম
শ্রেষ্ঠ অনুবাদক	পঞ্চদশ শতাব্দী	কৃত্তিবাস ওঝা	শ্রীরাম পাঁচালী
বিভিন্ন অনুবাদক	সপ্তদশ শতাব্দী	নিত্যানন্দ আচার্য	অদ্ভুত আচার্য
		চন্দ্রাবতী	রামায়ন
	অষ্টাদশ শতাব্দী	জগৎরাম রায়	শ্রীরাম মঙ্গল
		জগৎরাম রায়	শ্রী অদ্ভুত রামায়নি
		রামানন্দ ঘোষ	পুরাণ রামায়ন

কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালীর বৈশিষ্ট্য:

কাব্য সম্পদকে অতীতেও কৃত্তিবাসের কাব্য অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল। তাঁর কাব্যের বৈশিষ্ট্য নিম্নে আলোচনা করা হল —

(ক) মধ্যযুগে অনুবাদ সাহিত্যের দুটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল — (i) হুবহু মূলের আক্ষরিক অনুবাদ নয়, তা ভাবানুবাদ।

(ii) ভক্তিবাদের অবতারণা।

এই দুটি বৈশিষ্ট্যই কৃত্তিবাসের অনুবাদের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়।

(খ) কৃত্তিবাস তাঁর ~~এই~~ মহান কাব্য রচনার পেছনে দুটি কারনের কথা বলেছেন —

প্রথমত, পৃষ্ঠপোষক রাজার আদেশ।
দ্বিতীয়ত, লোকশিক্ষার সামাজিক দায়িত্ববোধ।

(গ) বাল্মিকী রচিত মূল রামায়ন কাহিনী অবলম্বনে কৃত্তিবাস তার রচনা করলেও তিনি তাঁর প্রতিটি শ্লোকের আক্ষরিক অনুবাদ করেননি। তিনি প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের পাঁচালীর আদর্শে তাঁর রামায়ন কাব্য রচনা করেছেন। তাই কৃত্তিবাসী রামায়ন হয়ে উঠেছে নতুন ~~স্বাদের~~।

(ঘ) কৃত্তিবাস তাঁর রামায়নে কোনো কোনো কাহিনী সম্পূর্ন কল্পনা বলে সৃষ্টি করেছিলেন, আবার কিছু পুরানাদি থেকে সংগ্রহ করেছেন।

ঙ) কৃত্তিবাস রচনা করেছেন বাঙালীর মন নিয়ে বাঙালীর মতো করে বাংলা রামায়ন সাধারন লোকেদের সহজ ভাষায় বোঝানোর জন্যে তাঁর অনুবাদ ——

'লোক বুঝাইতে, কৈলা কৃত্তিবাস পন্ডিত।'

চ) কৃত্তিবাসের শ্রীরাম পাঁচালী মহাকাব্য নয়, এটি হল বাল্মীকির মহাকাব্যের সেই গম্ভীর করুন তাম্য সাথে বাংলা পয়ারের ছন্দে পরিনত হয়েছে বাঙালির ভাবাপ্লুত ভক্তিরস।

ছ) শুধু কাহিনী বিন্যাসে নয় চরিত্র চিত্রনে, মুসলীমদের রসায়নে, বাঙালীয়ানার পরিচয়, ভক্তিবাদের প্রচারে, করুন রসের উৎসারে এবং স্বতন্ত্র কবি দৃষ্টির পরিচয়ে কৃত্তিবাসের অনুবাদের স্বাতন্ত্র অতুলনীয়।

মহাভারতের অনুবাদ :

সর্বাপেক্ষা বিখ্যাত ও সপ্তদশ শতাব্দীর মহাভারতের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুবাদক কবি কাশীরাম দাস। এই কবির মহাভারতের কাছে অন্যান্য অনুবাদগুলি নিষ্প্রভ হয়ে গেছে। কাশীরাম দাস আপামর বাঙালী জনসাধারণের অশেষ কল্যাণ সাধন করেছেন। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের বিরাম কাশীরাম দাসের রচনা কর্ম হলেও বাঙালীর জাতীয় জীবনে তাঁর মহাভারত অক্ষয় বটবৃক্ষের মত চিরস্থায়ী প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। কবি কৃত্তিবাসের মতো কাশীরাম দাস সমস্ত বাঙালী জাতির মনঃপ্রকৃতি, ব্যক্তি জীবন, সামাজিক ও পারিবারিক আদর্শ এবং নৈতিক মূল্যবোধের সঙ্গে কাশীরাম দাসের নাম বাংলার জাতীয় জীবনে চির-কালের জন্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছে। তাঁর অনূদিত গ্রন্থের নাম 'মহাভারত'।

মহাভারতের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য অনুবাদক ও তাদের কাব্যের নাম নিম্নে তুলে ধরা হল —

	সময়কাল	কবি	কাব্যের নাম
শ্রেষ্ঠ অনুবাদক	সপ্তদশ শতাব্দী	কাশীরাম দাস	মহাভারত
বিভিন্ন অনুবাদক	ষোড়শ শতাব্দী	কবীন্দ্র পরমেশ্বর	পাণ্ডব বিজয়
	সপ্তদশ শতাব্দী	নিত্যানন্দ ঘোষ	মহাভারত
	অষ্টাদশ শতাব্দী	পুরুষোত্তম দাস	পাণ্ডব পাঁচালী

■ কাশীরাম দাসের মহাভারতের বৈশিষ্ট্য ঃ

(ক) মহাভারত অনুবাদের ক্ষেত্রে কাশীরাম দাস হুবহু অনুবাদ করেন নি। তিনি কৃত্তিবাসের মতো মর্মানুবাদ করেছেন।

(খ) কবি সাধারন মানুষের কথা ভেবে, রসতৃষ্ণা চরিতার্থ করবার জন্য সাধারন মানুষের উপযোগী করে তাঁর মহাভারত রচনা করেছেন। তিনি কাব্যে উল্লেখ করেছেন ——

'সেই ব্যাখ্যা করি শ্লোক শুনয়ে ভারত।
গোবিন্দ করেন পূর্ন তার মনোরথ॥'

(গ) কাশীরাম দাস তাঁর মহাভারতে বেশ কিছু বিষয়ও যোগ করেছেন। যেমন, বনপর্বে শ্রীক্ষেত্র মাহাত্ম্য, শান্তিপর্বে একাদশী মাহাত্ম্য ও হরিমন্দির মার্জনের ফল প্রভৃতি মূল মহাভারতে নেই।

(ঘ) কাশীরাম অনুবাদের ক্ষেত্রে ভাবানুবাদের রীতিকে গ্রহন করেছেন।

(ঙ) কাশীরাম তাঁর কাব্যে কৃত্রিম কাব্যকলার অনুসরন করেছেন। সেজন্য তিনি তাঁর কাব্যে অলংকারমুখর ছন্দ কৌশলকে অনুসরন করেছেন।

ভাগবতের অনুবাদ ঃ

কবি কৃত্তিবাসের পদাঙ্ক অনুসরণে ভাগবত পুরাণের অনুবাদ করে বাংলা সাহিত্যকে সবিবর্ধিত ও সমৃদ্ধ করে গেছেন বর্ধমানের কুলীনগ্রাম নিবাসী কবি মালাধর বসু। সংস্কৃত সাহিত্যে আঠারোখানি পুরাণ ও অষ্টাদশ উপপুরাণের মধ্যে ভাগবত পুরাণই ভারতবর্ষে সর্বাধিক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে বারোটি স্কন্ধে বিভক্ত ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণের জীবন মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। মালাধর বসুর অনূদিত গ্রন্থের নাম "শ্রীকৃষ্ণ বিজয়"।

ভাগবতের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য অনুবাদক ও তাদের কাব্যের নাম নিম্নে আলোচনা করা হল

	সময়কাল	কবি	কাব্যের নাম
প্রথম অনুবাদক	পঞ্চদশ শতাব্দী	মালাধর বসু	শ্রীকৃষ্ণ বিজয়
বিভিন্ন অনুবাদক	ষোড়শ শতাব্দী	রঘুনাথ পণ্ডিত	শ্রীকৃষ্ণ প্রেমতরঙ্গিনী
	অষ্টাদশ শতাব্দী	শঙ্কর কবিচন্দ্র	গোবিন্দ মঙ্গল
		দ্বিজ রমানাথ	শ্রীকৃষ্ণ বিজয়

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়-এর বৈশিষ্ট্য :

(ক) ভাগবতের দশম স্কন্ধ ও একাদশ স্কন্ধ অনুবাদ করেছেন মালাধর বসু। তাছাড়া ভাগবতের বিষ্ণুপুরাণ ও হরিবংশের কাহিনী অনুসরণে বৃন্দাবন লীলা, রাসলীলা, দানলীলা ও নৌকালীলা অংশে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। তাছাড়া লোক সমাজে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণের লৌকিক প্রণয়লীলা তার অংশে স্থান পেয়েছে।

(খ) মালাধর বসু তার কাব্যে তিনটি পর্যায়ে কাহিনী বিন্যাস করেছেন। যথা — বৃন্দাবনলীলা, মথুরা-লীলা ও দ্বারকালীলা।

(গ) অনুবাদের ক্ষেত্রে মালাধর বসু ভাগবতের বিষয়কে পয়ার ত্রিপদী ছন্দে জনসাধারণের কাছে হৃদয়গ্রাহী করে তুলেছে।

(ঘ) এক ঐতিহাসিক পটভূমিতেই শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের রচনা, কারণ সেদিনের দুর্বল পরাজিত হতমান জাতির আন্তরিক আকাঙ্ক্ষাই ছিল গৌরবময়।

(ঙ) কাব্যসমাপ্তিতে কবি 'ধর্ম' ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বলেছেন ———

' জোতি রাখে তুব অধর্ম্ম পালিব
   তার বল দেখিব তার সব হবি লব॥'

তৎকালীন সমাজে পাঠান শাসনকালের সামাজিক বিশৃঙ্খলা এই উক্তির মধ্যে স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

শাসক শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা :

ইসলাম ধর্মান্তরীকরণের অবক্ষয় থেকে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করার জন্যেই মূলত অনুবাদ কর্ম শুরু হয়েছিল। এই ব্যাপারে স্বভাবসুলভ গুণ সাহিত্যের জন্য মুসলিম শাসকেরাও বিশেষ অনুরাগী ছিলেন। তাঁরা প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যের রসাস্বাদনের জন্য বিষয়বস্তুর সঙ্গে পরিচিত হওয়ার জন্য বিশেষ আগ্রহী হন। অনেক অনুবাদক কবিরা মুসলমান শাসকের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেন। ইলিয়াসশাহী বংশের নৃপতিরা বুঝতে পেরেছিলেন যে, সদা বিজিত একটি দেশকে শাসন করতে গেলে সেই দেশের মানুষের সঙ্গে সম্প্রীতি স্থাপন করতে হবে এবং দেশের আচার ব্যবহার ও সংস্কৃতিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে হবে। তাই মুসলমান শাসকেরা হিন্দু কবিদের দিয়ে পুরান অনুবাদ করিয়ে রসতৃষ্ণা চরিতার্থ করিলেন, পঞ্চদশ শতকীতে ভাগবত, রামায়ন ও মহাভারতের অনুবাদ হিন্দু - মুসলমান প্রীতির বন্ধনকে সুদৃঢ় করতে অনেক সাহায্য করেছে। আচার্য দীনেশচন্দ্র সেন লিখেছেন ———

"মুসলমান, ইরান, তুরান প্রভৃতি যে স্থান, হইতে আসুন না কেন ; এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙালি হইয়া পড়িলেন, তাঁহারা হিন্দু প্রজামণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেবমন্দিরের ঘন্টা বাজিতে লাগিল ; মহরম, ঈদ, সবেবরাত প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস দোল উৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল, রামায়ন ও মহাভারতের অপূর্ব প্রভাবে মুসলমান সম্রাটগণ মুগ্ধ করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাস নিবন্ধন বাঙ্গালা তাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল। হিন্দুদের ধর্ম, আচার - ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার জন্য তাহাদের পরম কৌতূহল হইল, গৌড়ের সম্রাট অনেক প্রবর্তনায় হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ হইল।"

উপসংহার :

এভাবে অনুবাদ সাহিত্য একদিকে আর্যসংস্কৃতি ও বাংলার লৌকিক সংস্কৃতির জীবন-ধারাকে মিলিয়ে দেবার অনুকূল প্রচেষ্টা সফল হল। আর্য সংস্কারের প্রভাবে বাংলা সাহিত্য লৌকিক ধর্মে সীমা ছাড়িয়ে নূতনতর বিষয়ের আনুষঙ্গিক পরিপুষ্টি ও বিকাশের সুযোগ পেল। উচ্চ ও নিম্নসম্প্রদায়ের হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যের মাধ্যমে হিন্দুসমাজের পুনর্গঠন হল, এর ফলে, বাংলা সাহিত্য বিকাশের ধারায় নূতন সৌন্দর্যে পরিপুষ্ট লাভ করল। অনুবাদ সাহিত্যের ফলে প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের সঙ্গে বাঙালীর যোগসূত্র স্থাপিত হল। মধ্যযুগে অনুবাদ কাব্যগুলি ভারতের পৌরাণিক সংস্কৃতিকে বহন করে জনসাধারণের কাছে সহজ-সরল ভাষায় পৌঁছে দিয়েছে। সংস্কৃত ভাষার বন্ধন থেকে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যকে বাঙালী কবিরা জনগণের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিয়েছেন। লোকজীবন ও লোকসংস্কৃতিকে উন্নত ও সমৃদ্ধ করার প্রয়াস দেখা যায় অনুবাদ সাহিত্যে।

সিদ্ধান্ত

বিস্তারিত আলোচনার পর আমি দেখলাম যে মধ্যযুগে মূলত ইসলাম ধর্মান্তকরণের অবক্ষয় থেকে হিন্দুসমাজকে রক্ষা করার জন্যই অনুবাদ শুরু হয়। উচ্চ ও নিম্ন সম্প্রদায়ের হিন্দু ও মুসলমানের ঐক্যের মাধ্যমে হিন্দু সমাজের পুনর্গঠন ও সর্বভারতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে বাঙালী জাতি ও বাংলা সংস্কৃতি ঐতিহ্যের যোগ স্থাপনের জন্য মধ্যযুগে অনুবাদ সাহিত্য ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ। এর ফলে বাংলা সাহিত্য নূতন কান্তি ও সৌন্দর্যে পরিপুষ্টি লাভ করল। এভাবেই অনুবাদ সাহিত্য মধ্যযুগে বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

গ্রন্থপঞ্জী

(i) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত → তৃতীয় খণ্ড : দ্বিতীয় পর্ব
অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী / কলকাতা : ৭০০ ০৭৩
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৫ - ২০১৬

(ii) আদি-মধ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়
৭/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট কলকাতা-৭০০ ০০৯
পুনর্মুদ্রণ → জুন, ২০১৫

(iii) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
ডঃ শ্রীমন্তকুমার জানা
ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৪

(iv) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
ডঃ দেবেশ কুমার আচার্য
২৭/১ কলেজ রো, কলকাতা - ৯
সপ্তম মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৬

গ্রন্থপঞ্জী

(i) বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত → তৃতীয় খণ্ড :
অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বিতীয় পর্ব
মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড
১০ বঙ্কিম চ্যাটার্জী / কলকাতা : ৭০০ ০৭৩
পুনর্মুদ্রণ : ২০১৫ - ২০১৬

(ii) আদি - মধ্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
তপন কুমার চট্টোপাধ্যায়
৭/৩, রমানাথ মজুমদার স্ট্রিট কলকাতা - ৭০০ ০০৯
পুনর্মুদ্রণ → জুন, ২০১৫

(iii) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস
ডঃ শ্রীমন্তকুমার জানা
ওরিয়েন্টাল বুক কোম্পানী প্রাইভেট লিমিটেড
৫৬, সূর্য সেন স্ট্রীট, কলকাতা - ৭০০ ০০৯
পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, ২০১৪

(iv) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস,
ডঃ দেবেশ কুমার আচার্য
২৭/১ কলেজ রো, কলকাতা - ৯
সপ্তম মুদ্রণ : আগস্ট ; ২০১৬

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

আমার এই প্রকল্পমূলক কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়ে যেসব ব্যক্তি সহযোগিতার ও পরামর্শের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই সেইসমস্ত গ্রন্থাগারকে যেখান থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন গ্রন্থ ও নথিপত্র আমার প্রকল্প রচনার কাজে সাহায্য করেছে। এছাড়া স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপিকা এবং অধ্যাপকদের পরামর্শ নির্দেশনা পরিচালনায় আমার এই অনুসন্ধান মূলক কাজটি সফল হয়েছে।

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

চন্দনা ভুঁইয়া

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

EXAMINED
(External) 2/9/23

শিক্ষক/শিক্ষিকার স্বাক্ষর

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়

চতুর্থ সেমিস্টারের অন্তর্গত এস. ই. সি. টু কোর্সের জন্য উপস্থাপিত

প্রকল্প পত্র : - মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে মানবতাবাদ

শিক্ষার্থীর নাম : - সোমাশ্রী মাইতি

সেমিস্টার : - চতুর্থ

পত্র : - এস. ই. সি. -টু

রেজিস্ট্রেশন নং - ২১১০৪০২৪৭ , ২০২১ - ২০২২

রোল নং - ১১১৪১৫২ - ২১০০২২

শিক্ষাবর্ষ : - ২০২২ - ২০২৩

Phone: 9932873484/7501133806

SWARNAMOYEE JOGENDRANATH MAHAVIDYALAYA

Govt. Aided General Degree College | Estd.: 2014

At+P.O.: Amdabad, P.S.: Nandigram, Dist.: PurbaMedinipur, PIN 721650

www.sjmahavidyalaya.in| Email: sjmahavidyalaya@gmail.com

CERTIFICATE

This is to certify that Somashree Maity Roll: 1114152 No: 210022, Reg.No:- 2110402947 of 2021-2022, a student of B.A. 4th Semester (Honours), Bengali Department, Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya for the session 2022-2023; submitted his/her project report for partial fulfillment of the syllabus of SEC-2,(CBCS) prescribed by Vidyasagar University. The project has been prepared under the supervision of Dr. Madhumita Basu and Surajit Mandal and ready to place before examiner for evaluation.

Dr. Ra...n Kumar Samanta
Principal
S.J Mahavidyalaya

Principal
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad :: Purba Medinipur :: Pin-721650

Supervisors

Dr. Madhumita Basu
Assistant Professor & HOD
Department of Begali.
S.J Mahavidyalaya

Head of the Department,
Department of Bengali
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad, P.S.- Nandigram, Purba Medinipur, Pin- 721650

Surajit Mandal
SACT-I, Department of Bengali
S.J Mahavidyalaya
Mahavidyalaya

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

সূচিপত্র

ক্রমিক নং	বিষয়	পৃষ্ঠা নং
১	প্রকল্প বিষয়ক সাধারণ আলোচনা	১ — ৩
২	প্রকল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন	৪
৩	বিষয় পর্যালোচনা	৫ — ৮
৪	বিষয় আলোচনা	৮ — ২৫
৫	উপসংহার	২৬ — ২৯
৬	সিদ্ধান্ত	৩০
৭	গ্রন্থপঞ্জী	৩১
৮	কৃতজ্ঞতা স্বীকার	৩২

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্প বিষয়ক সাধারণ আলোচনা

(ক) প্রকল্প কাকে বলে ?

⇒ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সুপরিকল্পিত মূল্যায়নের মাধ্যমে যে কাজ সম্পাদন করা হয় তাকে প্রকল্প বলে,

(খ) প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য গুলি কী কী?

⇒ প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য গুলি হল —

(i) সমস্যা কেন্দ্রিক :- প্রকল্প হল সমস্যা কেন্দ্রিক অর্থাৎ কোনো না কোনো সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে,

(ii) উদ্দেশ্য ভিত্তিক :- কোন বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

(iii) আত্মনির্ভর :- প্রকল্প মূলক কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের কাজের মধ্যে আত্মনির্ভর দেখা যায়,

(iv) সৃজনশীলতা :- প্রকল্পমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়,

(v) অনুসন্ধানমূলক কাজ :- প্রকল্প রূপায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা নানা রকমের অনুসন্ধানমূলক কাজের মধ্যে দিয়ে থেকে

(vi) বাস্তবতাকেন্দ্রিক :-

প্রকল্প ভিত্তিক কাজ সর্বদা কোন না কোন বাস্তব সমস্যাকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে,

(vii) সামাজিক গুনাবলির বিকাশ :-

প্রকল্পমূলক কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সমবেদনা, একে অপরের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি সামাজিক গুনাবলি গুলি বিকশিত হওয়ার সুযোগ গড়ে ওঠে,

(গ) প্রকল্প কত প্রকারের হয়?

=> প্রকল্প সাধারনত দুই প্রকারের হয়ে থাকে, যথা —
(১) একক প্রকল্প, (২) দলগত প্রকল্প।

(ঘ) প্রকল্পমূলক কাজের উদ্দেশ্য গুলি কী কী?

=> প্রকল্প মূলক কাজের উদ্দেশ্যগুলি হল —
(১) প্রতিটি শিক্ষার্থীকে উৎপাদনমূলক কাজের মধ্যে যুক্ত করা
(২) ছাত্র-ছাত্রীদের শৃঙ্খলাবদ্ধ করা এবং তাদের মধ্যে দলবদ্ধতার মানসিকতার বিকাশ সাধন করা।
(৩) ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে সহযোগিতা বোধ জাগিয়ে তোলা,
(৪) ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে কলমে কাজ করতে শেখানো,
(৫) ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশে সাহায্য করা।

(ঙ) প্রকল্প মূলক কাজের উপকারিতা কী?

=> (১) প্রকল্প রূপায়নের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

(ii) শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগত ভাবে কাজকরার মানসিকতা বৃদ্ধি হবে।

(iii) প্রকল্প রুপায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা পড়ার বই বাইরে গিয়ে নিজস্ব জ্ঞান অর্জনে সুযোগ পাওয়া যায়।

(চ) প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কী?

⇒ বর্তমানে প্রতিযোগিতা মূলক আধুনিক বিশ্বে প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রগতির জন্য প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। প্রতিটি দেশে এখন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সমষ্টির অর্থনীতিক দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে। তারই অংশ হিসেবে উন্নয়ন পরিকল্পনার সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহন করা হয়ে থাকে। এবং সেই প্রকল্প সমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পদ বিনিয়োগ করা হয় যাতে জাতীয় উন্নয়ন অব্যাহত থাকে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রকল্পের বিষয়বস্তু নির্বাচন

আমরা জানি বাংলা সাহিত্যে তিনটি যুগ যথা, — (i) প্রাচীন যুগ, (ii) মধ্যযুগ, (iii) আধুনিক যুগ। এই মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মানবতাবাদের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, যেমন — শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, বৈষ্ণবপদাবলী, চৈতন্যজীবনী কাব্য, শাক্তপদাবলী। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য প্রাক চৈতন্যযুগের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে আমরা দেখি গ্রাম বাংলায় সামাজিক প্রথা হিসেবেই বাল্যবিবাহ প্রচলিত ছিল। গ্রামীননারীর হৃদয় বেদনার এমন বাস্তবচিত্রই দেখা যায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ শাখা হলো অনুবাদ সাহিত্য। মধ্যযুগে বাংলা ভাষায় 'রামায়ন' মহাকাব্যের প্রথম অনুবাদ করেন কৃত্তিবাস ওঝা। এখানে সীতা চরিত্রে কৃত্তিবাস বাঙালী কুলবধূর লাজ নম্র সুষমাই ফুটিয়ে তুলেছে। মানুষের জয় ঘোষনার ক্ষেত্রে সমুদয় আয় স্থান পেয়েছে মধ্যযুগের আর এক সাহিত্য শাখা হলো মঙ্গলকাব্য। ~~চণ্ডী~~ এই মঙ্গলকাব্যে আমরা চেষ্টা করে মানবতাবাদে পারিয়ে পাই — চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে, চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে কালকেতু ফুল্লরার লৌকিক জীবন কাহিনীর মধ্যদিয়ে তাদের মানবতাবাদ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়, উক্ত বিষয় গুলির উপর আলোকপাত করার জন্য আমি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের মানবতাবাদ ~~প্রভাব~~ বিষয়টি নির্বাচন করেছি।

তৃতীয় অধ্যায়

বিষয় পর্যালোচনা

ভূমিকা :—

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস হাজার বছর বা তার চেয়েও বেশি সময়ের ইতিহাস। বাংলা সাহিত্য এই হাজার বছরের বেশি সময়ের ইতিহাসকে মনে রাখার ক্ষেত্রে যুগকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিতে পারি, যদিও সাহিত্যের ইতিহাসে সবসময় সাল তারিখের শুরু হয় না. আর শেষ ও হলো। বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসকে প্রধানত ৩টি যুগে ভাগ করা হয়েছে ———

① প্রাচীন যুগ বা আদিযুগ

② মধ্যযুগ

③ আধুনিক যুগ

বাংলা সাহিত্যের যুগবিভাগ

- আদিযুগ (দশম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী)
- মধ্যযুগ (পঞ্চদশ থেকে অষ্টাদশ)
  - প্রাক চৈতন্য যুগ (পঞ্চদশ শতাব্দী)
  - চৈতন্যযুগ (ষোড়শ শতাব্দী)
  - চৈতন্যোত্তর যুগ (সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী)
- আধুনিক যুগ (উনবিংশ ও বিংশ শতাব্দী)
  - গদ্য সাহিত্যের প্রস্তুতি পর্ব (১৮০০ – ১৮৫০ খ্রীঃ)
  - প্রাক রবীন্দ্র যুগ (১৮৫১ – ১৯০০ খ্রীঃ)
  - রবীন্দ্রযুগ (১৯০০ – ১৯৪১ খ্রীঃ)
  - রবীন্দ্রোত্তর যুগ (১৯৪২ খ্রী – সাম্প্রতিক কাল)

❀ মধ্যযুগ বিশ্লেষণ :—

তুর্কী আক্রমণের পর থেকে বাংলা সাহিত্যে মধ্যযুগের সূচনা। মধ্যযুগ বলতে ভারতের ইতিহাসে সাধারণভাবে বোঝায় মুসলমান রাজত্বকাল (১২০৬ খ্রীঃ থেকে ১৭০৭ খ্রীঃ পর্যন্ত), অনেকের মতে যে সচরাচর মধ্যযুগ বলতে 'সামন্ত সমাজের কাল' বোঝায়, কিন্তু ভারতে সামন্ত যুগের সূচনা হয়েছিল কুষাণ রাজত্বে (৩০০ খ্রীঃ – ৫০০ খ্রীঃ)। তার প্রসার রাজপুত

রাজাদের রাজত্বে মোটের উপর (৭০০ খ্রীঃ—১২০০খ্রীঃ) এবং তুর্কি বিজয়ে ১২০০ খ্রীঃ তে পুনরায় হয়। এর প্রথম দিকে শেষ হয় (১৫২৬ খ্রীঃ)। মোগল রাজত্বের শেষদিকে অর্থাৎ ১৭০০ খ্রীঃ থেকে সামন্তবাদী সমাজের ক্ষয় বেড়ে যায়, তা চলে পরবর্তী একশত বছর। এই কালপর্বে রচিত যে বাংলা সাহিত্য তার অনেকটাই ছিল প্রাচীনতর লেখার অনুসরণ। তবে তুর্কি আক্রমণের বাংলার সমাজ ও সাহিত্যকে যে তীব্র আঘাত দেয় তাতে বাঙালী জাতি ও সে জাতির সংস্কৃতি একটি বিশেষ রূপলাভ করে।
এই সম্পর্কে ডঃ সুকুমার সেন জানান —

"আর্য — অনার্যদের মধ্যে সংস্কৃতিগত ধর্মবিশ্বাস মত আচার ও ব্যবহারগত এবং ভাবধারাগত এই যে স্তরভেদ ইহা বিলুপ্ত হইয়া অখণ্ড বাঙালী জাতি গঠিত হইয়া উঠিবার পক্ষে একটি প্রধান বন্ধুর অন্তর। বাংলাদেশে আর্য — অনার্য দুই স্তরের পরস্পর মিলনকল্পে তুর্কী অভিযানযুগে প্রচণ্ড সংঘর্ষের অপেক্ষা করিতেছিল। মুসলমান শক্তির সর্বাত্মস্থিতায় আর্য ও অনার্যের মিলন হইয়া বাঙালী জাতি বিশিষ্ট রূপ পাইয়া জন্মগ্রহণ করিল।"

প্রাবন্ধিক গোপাল হালদার তুর্কী আক্রমণের ফলে তিনটি অনিবার্য সামাজিক আবর্তনের কথা বলেছেন —

① উচ্চ নিম্ন বর্ণের হিন্দুদের মধ্যে সংযোগ নিকটতর হল।

② পরাজিত হিন্দু সমাজ ও সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ রচনা করতে সচেষ্ট হল।

③ এই তাগিদেই রচিত হল সেকালের বাংলা সাহিত্য।

প্রাচীনযুগে মানবতাবাদ :—

প্রাচীন ও মধ্যযুগের ভারতীয় সাহিত্যের মতই বাংলার সেই যুগের কাব্য সাহিত্য ও ধর্মীয় অনুভূতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। আদিযুগের বাংলা সাহিত্যের একমাত্র নিদর্শন চর্যাপদ রচিত হয় বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের দ্বারা। যোগ এবং চর্যার মধ্যদিয়ে জন্ম – মৃত্যুর অতীত হওয়াই ছিল সাধকদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ধর্মকথা সেখানে প্রধান অবলম্বন হলেও সমাজ ও মানুষের কথা সেখানে কম নেই। বাইরের যে অর্থ তার মধ্যে মানুষের জীবনের বহু সুখ – দুঃখ, বেদনা – বিরহ নানা অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়, সমাজের কথা বলা বা মানবতাবাদের কথা বলা সেই সব কবিদের উদ্দেশ্য ছিল না সত্য, কিন্তু রূপকের আড়ালে যে তত্ত্বকথা বা ধর্মের দর্শনের সংগীত তারা রচনা করেছিলেন তা তাদের অজান্তেই হয়ে উঠেছিল মানব-জীবন কাব্য।

[1] চর্যাপদে এটাও জানা যায় যে সেকালের মানুষের মধ্যে উচ্চ – নিম্ন বর্ণীয় ভেদাভেদ, বর্ণ ও ধর্ম ভেদ ছিল। কাহ্নপাদের একটি পদ থেকে জানা যায় যে ব্রাহ্মণ নর-নারীরা শবর, চাঁড়াল, ডোম, শুঁড়ি ইত্যাদি শ্রেণীর মানুষকে ঘৃণা করতেন ——

"নগর বাহিরি রে ডোম্বি তোহোরি কুড়িআ,
ছোই ছোই যাই সো ব্রাহ্মণ নাড়িআ।"

চর্যার কবিরা যে শুধু ধর্মের কথা বলেছেন তা নয়,

যে সমাজে তারা বাস করতেন সেখানকার মানুষের জীবন ও তাদের কাব্যের বিষয় হয়ে উঠেছিল।

মধ্যযুগে মানবতাবাদ:-

মধ্যযুগের যে বাংলা সাহিত্য তা ছিল যেমন ধর্ম নির্ভর, তেমনি ছিল অলৌকিকতা ও অতিপ্রাকৃত রসে পরিপূর্ণ। এই সময়ে রচিত পৃথিবীর প্রতিটি সাহিত্যেই যে অলৌকিক কাহিনী বর্ণিত হয়েছিল তার মূল রস ছিল অদ্ভুত রস। কবিদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল দেবমাহাত্ম্য প্রচার। মানুষ নিজেকে দেবতার ক্রীড়নক হিসাবেই দেখত। তাই সেই সাহিত্যে প্রধান ছিল দেবতার লীলা। এর মধ্যে এসেছে ধর্মকথা ও পুরাণ কথা। মানুষ তখনও নির্ভর হয়ে দেব-পূজার মধ্য দিয়েই অসহায়তার কথা বলেছে। কখনো দেবতার কাছে প্রার্থনা করে আবার কখনো দেবতা নিজে মানুষ হয়ে ওঠেন। এই ধর্মনিরপেক্ষ ধারায় যে সাহিত্য তা ছিল মানবমুখী সাহিত্য। তবে তা নিরপেক্ষ মানবতাবাদ নয়, দেববাদ নির্ভর মানবতাবাদ।

মধ্যযুগীয় বাংলাসাহিত্যের শাখা অনেক গুলি আলোচনার সুবিধার্থে কত গুলি পর্বে শাখা গুলিকে উল্লেখ করলাম —— শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, মঙ্গলকাব্য, ~~[illegible]~~ বৈষ্ণবপদাবলী, চৈতন্যজীবনী কাব্য, শাক্তপদাবলী, আরাকান রাজসভার কাব্য, নাথসাহিত্য, মৈমনসিংহ গীতিকা বা পূর্ববঙ্গ গীতিকা, এর মধ্যে আরাকান রাজসভার কাব্য ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা হল মানবজীবন রস নির্ভর

ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য। বাকি সাহিত্য শাখাগুলির মূলে অবলম্বন ও উদ্দেশ্য ধর্মকথা বিশ্লেষণ হলেও, এর মধ্যে কি প্রকারে মানব জীবনরস প্রধান হয়ে উঠেছে তা আমাদের আলোচ্য বিষয়। ——

❀ শ্রী কৃষ্ণকীর্তন কাব্য :-

আদি মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম নিদর্শন "শ্রীকৃষ্ণকীর্তন" কাব্য, উদ্দেশ্যনীর ধর্মতত্ত্ব একান্তই বিষয় হলেও ধীরে ধীরে নায়ক পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ পল্লী যুবক হয়ে উঠেছেন। এই কাব্যের জন্মখণ্ডে দেখা যায় কংসবধের জন্য কৃষ্ণ অবতার ——

"সকল দেবের বোলেঁ হরি বনমালী,
অবতার করি করে ধরনীতে কেলি।।"

কৃষ্ণের পর রাধার জন্ম হয় ——

" কৃষ্ণাক্কের সম্ভোগ কারণে।
লক্ষ্মীকে বুলিল দেবগণে।।
আল রাধা পৃথিবীতে কর অবতার,
থির হউ সকল সংসার"

এরপর পৃথিবীর মাটিতে চরিত্র দুটি দেবতার মুখ মলিন হয়ে আসে। বাস্তবের রূঢ়তায় কৃষ্ণ চরিত্রের অনেকখানি খেলো হয়ে গেছে কবি মধ্যে মধ্যে দেবত্ব এর কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন। 'শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্যামী' অর্থাৎ রাধাকে না দেখলেও তার সঠিক সন্ধান বড়ায়িকে বলে দিয়েছে

——

"বকুল তলাতে আছে যে সুন্দরী সতী",

বড়ায়ি রাধাকে বলেছে —

"সে দেব সনে
নেহা বাড়াইলে
হঅ বিষ্ণুপুরে সুখী",

কৃষ্ণ বহুবার নিজের মুখে দেবত্ব প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করে বলেছে —

"বেদ উদ্ধারিলোঁ
ক্রীড়া সাগর জলে
লীলা এ আমো মুরারি
দৈত্য দলিলোঁ
অসুর সংহারিলোঁ
শঙ্খ চক্র গদা ধরী",

কবি ধর্মের আবরণে জীবনের প্রেমকাহিনী রচনা করেছেন, নায়ক এখানে বৃন্দাবনের কৃষ্ণ নন, পল্লী যুবক। এই কাব্যে বংশীখণ্ড থেকে শুরু হয়েছে লৌকিক প্রেমের প্রকৃত অভিসার। রাধার প্রেমানুরাগে মনোনিত হয়ে শ্রীকৃষ্ণের জবরদস্তি, জুলুম মনোভাবের মধ্যে কোনোও অনন্ত কৃষ্ণ, দেব জগন্নাথকে খুঁজে পাওয়া যায় না। বংশী খণ্ডের সেই অসাধারণ চরণ স্বর্গ ও মর্ত্য প্রেমের কাব্যিক মাধুর্য অনিবার্য —

"কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী নইকুলে,
কেনা বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ গোকুলে",

পরম প্রেমময়ের বংশীধ্বনি শুনে বধূর রাধিকার যে সুপ্রভাত তার মধ্যে ঐশ্বরিক মাহাত্ম্য নেই। এখানে যে শ্রীকৃষ্ণ তাকে বেনীমাধব বলাটাই ঠিক হবে। তার বৈদগ্ধ্য

বালিকা রাধার উক্তি—

"আন্তর সুখে এ মোর কাহ্নু অভিলাষে।"

কৃষ্ণের ভুবনমোহন বাঁশীর সুরে রাধার বৈবাহিক কাজের বন্ধন শিথিল হয়ে যায়—

"আকুল শরীর মোর বে আকুল মন,
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন।।"

যাই হোক, ধর্মীয় মাহাত্ম্য বর্ণনার সুযোগে 'শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন' কাব্যের কবি লৌকিক নর-নারীর জীবনেরই সুখ-দুঃখ, হৃদয়ের সহজেতন-প্রসাধন, যন্ত্রণা, আনন্দানুভূতি বর্ণনা করেছেন। এই জন্যেই মধ্যযুগের এই কাব্যটির মতে মানব ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অনুবাদ সাহিত্য ধারা :-

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গুরুত্বপূর্ণ শাখা অনুবাদ সাহিত্য। এই যুগে বাংলা ভাষায় 'রামায়ণ' মহাকাব্যের প্রথম অনুবাদ করেন কৃত্তিবাস ওঝা। এর নায়ক রামচন্দ্রের মধ্যে মহর্ষি বাল্মীকি যে ভাবে দেবত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন-কৃত্তিবাস সেদিকে যাঁননি। একভাবে এটি বাংলার জীবন-কাব্য। এই গ্রন্থে অযোধ্যার রাজপরিবারের যে মহিমা ছিল, মহর্ষির হাতে যা ছিল 'মহাকাব্য' কৃত্তিবাসের হাতে তা হয়ে উঠেছিল 'পাঁচালী'। যুদ্ধ নয়, রাজনীতি নয়, বাংলার গার্হস্থ্য জীবন—এর প্রধান আলোচ্যবিষয়।

(1) রামায়ন :-

কৃত্তিবাসের রামচন্দ্র মহর্ষির নায়কের ন্যায় ক্ষত্রিয়

বীর নন। নেই তাঁর পৌরানিক মাহাত্ম্য, বীরত্ব কঠোরতা। তিনি কোমলতা, মাধুর্য্য ও বিনয়ের অধিকারী। সীতাকে বিসর্জন দিতে গিয়ে সাধারন প্রেমিক যুবকের মত তিনি বিরহ ও বিলাপ প্রকাশ করেন —

আজি হইতে গেল মোর ভোগ অভিলাষ,
আর না যাইব আমি সীতার নিবাস,
আজি হইতে দূরে গেল সে সুখ সম্ভাষ,
আর না যাইব আমি জানকীর স্থান।।

কৃত্তিবাসের আর এক আবিষ্কার কোমলময়ী, ধরিত্রী কন্যা, বাঙালী বধূ, সংসারে শ্রী ও কল্যানের অধিকারিনী জনক সীতা চরিত্র। পতিপ্রেম তাঁর কাছে পরম ধর্ম। বাল্মীকির সীতা তেজস্বিনী, ক্ষত্রিয় কন্যা, অনেকাংশে বীরাঙ্গনা সুলভ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে অনন্যা। কৃত্তিবাসের সীতা প্রেমময়ী, সহনশীলা, সতীনারী। তিনি পাতালে প্রবেশ কালেও পতির প্রতি প্রেম জ্ঞাপন করে জানান —

"জন্মে জন্মে প্রভু তুমি হয়ো মোর পতি,
আর কোন জন্ম মোর কারো না দুর্গতি।।

কৃত্তিবাসের কাব্যের কোথাও শ্রীরামচন্দ্রকে নারায়ণের অংশ বলে মনে হয় না। তিনি শ্রেষ্ঠ রাজা, শ্রেষ্ঠ ভ্রাতা, শ্রেষ্ঠ পুত্র, স্বামী হিসাবে, প্রজাপালক হিসাবে, নীতিনির্ধারক হিসাবে তিনি মানুষের প্রতিনিধি, লক্ষ্মণ আদর্শ বাঙালী দেবর, হনুমান বাঙালী ভৃত্য, লব কুশ দেবশিশু নয়, বাঙালী ঘরের দুই সন্তান, তাছাড়া কৃত্তিবাসের কাব্যের উদ্দেশ্য আর্য ও অনার্য শক্তির দ্বন্দ্ব দেখানো নয়, একান্তভাবে বাঙালী জীবন, ধর্ম, অনুশীলন,

চর্চা - চর্যা, আচার - বিশ্বাস দেখানোতেই এ কাব্যের সার্থকতা, এই পুরাণ-আশ্রিত কাহিনী, বাঙালি কবি কল্পিত, রামচন্দ্রের মাহাত্ম্য তিনি মানুষ। মানুষের কাব্য রামায়ণ। সীতা সাধ্বী, লক্ষ্মণ অনুগত। মানবতাবাদের এই জন্যেই কৃত্তিবাসের কাব্যের সার্থকতা।

② মহাভারত :-

অনুবাদ শাখার অন্যতম আর এক মহাকাব্য কাশীরাম দাসের 'মহাভারত', এখানে ব্যাসদেবের 'মহাভারত' এর মত অস্ত্রের গর্জন নেই, রাজনীতির জটিলতা তীব্র নয়। এই ভক্তিরস পরিণতিতে মানবরসেরই নামান্তর হয়ে উঠেছে এখানে সভাপর্বে দ্রৌপদী ও হিড়িম্বার যে বন্দ বর্ণিত হয়েছে তা সপ্তদশ শতাব্দীর বাঙালি সমাজের দুই সতীনের কলহকে স্মরণ করিয়ে দেয়। দ্রৌপদী ও হিড়িম্বা রক্ত - মাংসের মানবী। জীবনের উপলব্ধিতে, মানবের জয় ঘোষণায় কবির প্রতিভা ব্যস্ত থেকেছে। তাই বাংলা কাব্যের আধুনিকতার অন্যতম পূজারী, নবজাগরণের অন্যতম নায়ক মাইকেল মধুসূদন দত্ত বলেছিলেন ——

"হে কাশী কবীশদলে তুমি মহা - পুণ্যবান"।

③ শ্রীকৃষ্ণ বিজয় :-

মালাধর বসু অনূদিত 'শ্রীকৃষ্ণবিজয়' গ্রন্থে ভক্তিরসের প্রাধান্য, শ্রীকৃষ্ণের বিজয় ঘোষণা তার আসল উদ্দেশ্য, কৃত্তিবাস ও কাশীরামের মত সার্বজনীন মালাধরের লেখনীতে প্রবীণ স্থান লাভ করতে পারেনি, তার মধ্যে জীবন জিজ্ঞাসার বহু ইঙ্গিত সেখানে স্থানিত, শ্রীরাধিকা যখন বলেন ——

" অক্ষয় যৌবনলোভে লোক প্রভাইতে পারে,
কিন্তু হেন ধন সতী ছাড়ি দিব কারে॥"

তখন রক্তমাংসের মানবীর জীবনাকাঙ্ক্ষা অনিবার্য ভাবেই ধ্বনিত হয়।

মঙ্গলকাব্য :-

'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' হোক, আর অনুবাদ সাহিত্যই হোক না কেন, মানব-জীবন, মানুষের জয় ঘোষণার ক্ষেত্রে সহায়- নয় স্থলে মধ্যযুগের আর এক সাহিত্য যাহা মঙ্গলকাব্যের, প্রয়োজন সভাবীর ক্ষেত্র দিকে সাধারণ মানুষ আপন অস্তিত্ব রক্ষার জন্য দেবীর চরণে স্মরণ নেয়, প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা, সামাজিক অস্থিরতা, রাজনৈতিক সঙ্কট এবং সর্বোপরি মগ ও পোর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারে বিপন্ন মানুষ দেবীর চরণে স্থান নেন। রচিত হয় দেব-দেবীর প্রশস্তিমূলক একশ্রেণীর কাব্য — 'মঙ্গল কাব্য'। মনসামঙ্গল চণ্ডীমঙ্গল, ধর্মমঙ্গল ইত্যাদি মঙ্গলকাব্য এই শ্রেণীর অন্যতম উদাহরণ।

(1) মনসামঙ্গল কাব্য :-

'মনসামঙ্গল' প্রাচীন মঙ্গলকাব্য, মনসা দেবীর প্রশস্তিমূলক রচনা এটি। তার পূজা প্রচারের কাহিনীই এই কাব্য, কিন্তু সেই পূজা প্রচারকে কেন্দ্র করে দেবী মনসার জয় এখানে প্রাধান্য পায় নি, বরং দেব-মানব দ্বন্দ্বের কাব্য হয়ে উঠেছে। 'মনসামঙ্গলে', চম্পক নগরের শ্রেষ্ঠ বণিক চাঁদ সওদাগর। দেবী বণিক চাঁদ সওদাগরকে দিয়ে এই পূজা প্রচার করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু যে কারণে দেবীর ভয়ে ভীত

ছিল মানবকুল। মানুষ নিজেকে ঈশ্বর -ঈশ্বরীর কৃপাপ্রার্থী ভাবত - সেই যুগে মনসার নির্দেশকে উপেক্ষা করে বণিক চাঁদ সওদাগরের জবাব দেন —

"যে হাতে পূজেছি আমি শিব শূলপাণি,
সে হাতে কেমনে পূজি চ্যাংমুড়ি কানি॥"

এখানে চাঁদ সদাগরের কথা জয় জয় পৌরুষের, দেবী মনসার কুটিল ষড়যন্ত্রের কাছে বারবার চন্দ্রধরকে পরাজয় বরন করতে হল ও তিনি দৃঢ়কন্ঠে মনসার প্রতি ঘৃনা বর্ষন করেছেন বলেছেন —

"কারে কি বলিব আমি নিজ কর্মফল,
দেবকন্যা হইয়া স্বর্গে না হইল স্থল॥"

চন্দ্রধরের মধ্য দিয়ে 'মনসামঙ্গল' কাব্য মানবতাবাদের জয়গান পরিবেশন করেছে। চন্দ্রধরের পরিবারের প্রত্যেকে কথোপকথন, বুকভাঙা কান্না, তীব্র বেদনা, প্রেমাবিরহ পাঠকের জীবনে আদর্শ স্থানীয় হয়ে উঠেছে। চন্দ্রধর পিতা হিসাবেও আদর্শ, কনিষ্ঠ পুত্র লক্ষীন্দরের হঠাৎ মৃত্যুতে পিতা চাঁদের শোক আমাদের ভারাক্রান্ত করে —

"কোথা লখাই কোথা লখাই বলে সদাগর,
চম্পকের রাজা আমার বালা লক্ষীন্দর॥"

সনকা আদর্শ মাতা। একজন বাঙালী নারী তিনি। পুত্রকে হারিয়ে তার আর্তনাদ আমাদেরকে বেদনাতুর করে তোলে —

"সর্বপূর্ণ বর্ধর তিলেক দোষ নাই।
যে বলিছু বর্ধর মেলেকে লখাই॥"

তিনি ভক্তিপ্রানা নারী। এক সরল বাঙালী মাতার মত সংসারের কল্যানের জন্য তিনিও ভক্তিপ্রানচিত্তে মনসার

পূজা করেন। তাঁদের সাথে মনসার বিরোধের তীব্রতা স্পর্শ করে না। এর ফলে একে একে তাকে হারাতে হয় সাত পুত্রকে। প্রতিবাদের সমস্ত জোর ছিল না। লক্ষীন্দরের মৃত্যুর সংবাদ তাকে পাগলিনী করে, তাই তিনি তার বধূকে দোষারোপ করেন। শুধু সনকা নয়, বেহুলা ও ত্যাগে, প্রেমে, সাহসিকতায়, সংযমে অনন্যা এক নারী। দেবীর ষড়যন্ত্রের সাথে লড়াই করে তিনি তাঁর প্রেমকে জয়ী করেছেন। তিনি বলেছেন —

"সাহসে জিয়ার শক্তি,"

তিনি তার কথা বলেছেন, তবে এই শক্তি মানুষের শক্তি, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে প্রেমিক ও সতী রূপে বেহুলার অনেক বড়ো স্থান রয়েছে।

☐ দেব - দেবী চরিত্র লেখায় এই কাব্যের কবিরা মানব জীবনরস পরিবেশন করেছেন। দেবী মনসা হলেন - কুটিল এবং ষড়যন্ত্রপ্রবণ। মানবীর পরিচ্ছেদেই তাকে পাওয়া যায়, শিব বৃদ্ধ মানুষ তার সংসারের অভাব, কষ্ট, দারিদ্র কৃষিভিত্তিক বাঙালী জীবনের প্রতিরূপ। 'মনসামঙ্গল' তাই দেবীর পূজা প্রসারের কাহিনী হলেও মানবতার প্রথম সুস্পষ্ট জয়েরও কাব্য। মানবতাবাদের ধারক - বাহক চাঁদ তার উদ্দেশ্য তাই কবি কালিদাস রায় বলেন —

"তুমি দেবতারো বড় এ যুগের অর্ঘ্য ধরো
বন্দী সপ্ত চক্রের বীর",

② চণ্ডীমঙ্গল কাব্য :-

চৈতন্যপরবর্তী কালে রচিত চণ্ডীমঙ্গলকাব্যে মানবতাবাদ আরো সুস্পষ্ট। হর - গৌরীর জীবন কিংবা কালকেতু - ফুল্লরার

আখ্যানে সমাজের সাধারণ মানুষের দুঃখ-বেদনার কথা অভিব্যক্ত হয়েছে। দারিদ্র পীড়িত জীবনের অসহায়তা সেখানে ব্যক্ত হয় গৌরীর উক্তিতে ——

"দরিদ্র পতি যার বিফল জনম তার
দারিদ্র্য দুঃখরাশি মাঝে";

ফুল্লরার কথায় ধ্বনিত হয় শোষিত নিপীড়িত মানুষের ক্রন্দন ——

"প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক,
উদরের জ্বালা আর সোদরের শোক"।

দেবী চণ্ডী পূজা পাওয়ার প্রত্যাশায় মানবী বেশেই উপস্থিত হয়েছেন কালকেতু এবং ধনপতি সদাগরের গৃহে। ফুল্লরা কিংবা খুল্লনাকে যে আত্মপরিচয় দিয়েছেন তাতে তাঁর মানবী রূপটিই প্রকটিত হয়েছে। দেবী হলেও তিনি সন্দেহের ঊর্ধ্বে উঠতে পারেননি। তাই কালকেতুকে সাত ঘড়া ধন দান করার পর কালকেতুরই অনুরোধে এক ঘড়া ধন বহন করে তার বাড়ী নিয়ে যাচ্ছেন, তখন কালকেতুর বারবার পিছন ফিরে দেখার মধ্যে দেবীর দেবীসত্ত্ব ক্ষুণ্ণ হয়, কালকেতুর সন্দেহ, লোভে বশবর্তী হয়ে দেবী ধনভর্তি ঘড়াটি নিয়ে পালিয়ে যাবে, এই ধারণাই তো দেবীকে মর্ত্যমানবীতে রূপান্তরিত করে দেয়। চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের ধূর্ত বেনে মুরারি শীল, প্রতিহিংসাপরায়ণ খলচরিত্র ভাঁড়ুদত্ত, কুমন্ত্রণা দাত্রী দাসী দুর্বলা — এরা আমাদেরই চেনা জগতের মানুষ, সুতরাং চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সর্বত্রই প্রাধান্য পেয়েছে মানুষের কথা। কালকেতু ও ফুল্লরার জীবন দারিদ্র্য পীড়িত ব্যাধ জীবনের মুক্তি পর্ব, একারণেই বাস্তব রস সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে দৈববাণী সম্পূর্ণ না হলেও অনেকাংশে তিরোহিত হয়েছে।

③ ধর্মমঙ্গল কাব্য :-

ধর্মের বেদীতলে বসে 'ধর্মমঙ্গল কাব্য' রচিত হলেও ধর্মঠাকুর লৌকিক দেবতা, রোগ-নিরাময় ও প্রজননের দেবতা তিনি। এই কাব্যের বিভিন্ন স্থানে সমাজ ও মানব জীবনের কথা থাকলেও বাস্তবরসের দিক থেকে 'চণ্ডীমঙ্গল' এর সমগোত্রীয় নয়। তবে কাব্যটির রোমান্টিকতা আছে, এর রঞ্জাবতী, কলিঙ্গা ও কানাড়া চরিত্রের মধ্য দিয়ে নারীজীবনের নানা সমস্যা প্রতিফলিত হয়েছে। মহম্মদ খান চরিত্র মহত্বে জীবন্ত, লাউসেন মানবিক গুনের অধিকারী।

④ অন্নদামঙ্গল কাব্য :

'দেবতারে প্রিয় করি, প্রিয়েরে দেবতা' — রবীন্দ্রনাথের এই উক্তি ভারতচন্দ্রের 'অন্নদামঙ্গলের' দেবতা ও মানুষ সম্বন্ধে প্রযোজ্য। এই কাব্যের লক্ষ্য সাধারন মানুষ এবং কাব্যের দেব - দেবীরাও দেবতা নন, তারা মানুষ, মর্ত্যকলুষ মানুষের সুখ - দুঃখ, হাসি - কান্নাই দেবতাদের চরিত্রে রুপায়িত হয়েছে। অন্নপূর্ণার রুপবর্ণনা ও বিদ্যাসুন্দরের বিহার রুপ - বর্ণনার পার্থক্য অতি অল্পই। ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করেছেন নিজের অন্তরের ভক্তির তাগিদে নয়, মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে। তবে কবি মঙ্গলকাব্য রচনা করলেও কাব্যে দেবতার কথা অপেক্ষা মানুষের কথা প্রাধান্য পেয়েছে। শিব — অন্নপূর্ণা — নারদ — ব্যাসদেব — সকলকেই ভারতচন্দ্র মানবিক গুনে ভূষিত করেছেন, শিবের হিমালয় যাত্রা, শিব - বিবাহ, হকান্দল ও শিবনিন্দা, হর - গৌরীর কথোপকথন, হর - গৌরির বিবাদ - স্কলন, শিবের ভিক্ষাযাত্রা, ব্যাসের

শিবনিন্দা, ব্যাসের প্রতি সভার নিন্দা, ব্যাসের কৃত অন্যায় প্রতি তিরস্কার প্রভৃতি অংশে দেবতাদের আচরণ পুরোপুরি মানবিক, তাদের আচার-আচরণে মানবিক দোষ-ত্রুটিগুলি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। হরগৌরীর সংসারকে অবলম্বন করে ভারতচন্দ্র একেবারে ঘরোয়া, মানবিক রূপকে ফুটিয়ে তুলেছেন, তিনি সেই শিবকে ভিক্ষায় বেরতে হয়েছে। এমন কি ছেলেদের সাথে বলতে হয়েছে —

" নিত্য নিত্য ভিক্ষা মাগি আনিয়া খাওয়াই,
সাধ করে একদিন পেট ভরে খাই"

শিবের কাছে গৌরী সুলক্ষণা নন। তাই যুক্তির তীক্ষ্ণ জালে, ব্যাঙ্গের কশাঘাতে জর্জরিত করে গৌরী শিবকে বলেন —

" অলক্ষণা সুলক্ষণা যে হই সে হই,
মোর আসিবার পূর্বকালে ছিল কই,,
নিয়াছিলে বুড়াটি যখন বর হয়ে,
গিয়াছিলে মোর তরে কত ধন লয়ে"

শিব-পার্বতীর ঘরোয়া মানবিক জীবনের বিশ্বস্ত ছবি এঁকেছেন ভারতচন্দ্র।

ব্যাস কাহিনীতে সভা-ব্যাস প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র দেবতার মধ্যে মানবীয় দিকের ছবি এঁকেছেন। বিষ্ণুভক্ত ব্যাস শিবের নিগ্রহে অতিষ্ঠ হয়ে বিষ্ণুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করেন —

"বিষ্ণুর দেখেছি গুণ   বন্দী করেছিল খুন
কিছুই যোগ্যতা তার নাই।

ব্যাস-ও অন্নদার পারস্পরিক কথনে মানবীয় রূপই প্রধান হয়ে ওঠে। অন্নদাকে তিনি জানান —

"আমি যারে প্রকাশিনু আমি যারে বাড়াইনু
সে মোরে তুচ্ছ কার করে,
অতএব পারিলে দরে অতএব প্রত্যয় করে
এ দুঃখ পরাণে নাহি সহে,

অন্নদাও ব্যাসের প্রতি তীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করে জানান —

"আমার জাতির দায়ে ঠাকিবে তোরে,
কোন জাতি তোমার বুঝাও দেখি মোরে"॥

এখানে অন্নদা দেবী নন, সামান্য মানবী। 'অন্নদার ভবানন্দ ভবনে যাত্রা' অংশে ভারতচন্দ্র দেবীকে নামিয়ে এনেছেন ঈশ্বরী পাটনীর নায়ে। সেখানে তিনি স্বয়ং অন্নদার পরিচয় দান, ঈশ্বরী পাটনির খেয়া নৌকায় আরোহীরে উপস্থিত দেবীর মানবী রূপকেই প্রকাশ করে —

" বিশেষণে সবিশেষ কহিবারে পারি,
জানহ স্বামীর নাম নাহি ধরে নারী॥

❀ বৈষ্ণবপদাবলী :-

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ সংগীত 'বৈষ্ণবপদাবলী'। শ্রীরাধা ও কৃষ্ণকে কেন্দ্র করে রচিত পদাবলী বা গানকে বৈষ্ণব পদাবলী বলে। তবে চৈতন্য বিষয়ক কিছু পদ-ও এই পদাবলীতে অন্তর্ভুক্ত। বৈষ্ণবদের কাছে শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ং নারায়ন আর শ্রীরাধিকা লক্ষ্মী। তাই রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদাবলী এক অর্থে ধর্মীয় কাব্য দেব-দেবীর লীলা এর বিষয়। চৈতন্যদেবের আবির্ভাবই খ্রীষ্টিয় ষোড়শ শতকের প্রথমভাগে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় সৃষ্টি করে, এই বৈষ্ণবদের কাছে বৈষ্ণব পদাবলী ছিল বৈষ্ণব তত্ত্বের রসভাষ্য। তাই শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁর

'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' গ্রন্থে জানান —

"আত্মেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা তারে বলে কাম,
কৃষ্ণেন্দ্রিয় প্রীতি ইচ্ছা ধরে প্রেম নাম"।

শ্রীচৈতন্যের মধ্যে বৈষ্ণবরা 'অচিন্ত্যভেদাভেদ' তত্ত্বের অনুসন্ধান করেন। ফলে বৈষ্ণবপদাবলী আধ্যাত্মিকতার কাব্য হয়ে ওঠে। কিন্তু এর মধ্যে ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক আবেদনেরও বহুপরিচয় রয়েছে। রবীন্দ্রনাথের এই মানবিকতা অনুসরণ করে 'সোনার তরী' কাব্যের বৈষ্ণব কবিতায় বলেন —

"শুধু বৈকুণ্ঠের তরে বৈষ্ণবের গান"।

ব্যক্তি জীবনের অভিজ্ঞতা না থাকলে তত্ত্ব - সত্ত্বই এমন বিরহ - মিলনের পদ লেখা সম্ভব নয়। আমরা জানি যে জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস প্রমুখেরা ব্যক্তিজীবনে নারীর প্রেমে ছিলেন মুগ্ধ। আসলে সেই মুগ্ধতা যেন বৈষ্ণব পদাবলীর রূপকে পরিবেশিত হয়েছে। উল্লেখ্য যে, জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাসের কালে 'গৌড়ীয় বৈষ্ণবতত্ত্ব' ছিল না। ফলে তাদের পদে তত্ত্বের বন্ধন নেই। বিদ্যাপতির 'মাথুরে'র পদে রাধার কণ্ঠে যে হাহাকার ধ্বনি পরিবেশিত হয়েছে তা যে কোন বিরহিণী নায়িকার মর্মজ্বালা বলে মনে হয় —

"এ সখি হামারি দুখের নাহি ওর
এ ভরা বাদর মাহ ভাদর
শূন্য মন্দির মোর"।

বিদ্যাপতির প্রার্থনার পদের মধ্যে দোষ প্রবল মানুষের আত্মসমালোচনা ও সংযমের কথা প্রকাশিত, চণ্ডীদাসের রাধার কণ্ঠস্বরে প্রকাশিত হয় প্রকৃত প্রেমিকার জীবন উপলব্ধির উক্তি —

কলঙ্কী বলিয়া ডাকে সব লোক
তাহাতে নাহিক দুঃখ,
তোমার লাগিয়া কলঙ্কের হার
গলায় পরিতে সুখ,

এই সাধনায় দেহ নেই। সংগ্রাম ও একনিষ্ঠতা প্রধান। জ্ঞানদাসের রূপানুরাগের পদ বর্ণনা সৌন্দর্যে অতুলনীয়, একজন নারীর রক্তমাংসের আকাঙ্খার তীব্র আকুতি সেখানে ধ্বনিত —

"রূপলাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর,
প্রতিঅঙ্গ লাগি কান্দে প্রতি অঙ্গ মোর।
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কান্দে,
পরান পিরীতি লাগি থির নাহি বান্ধে।"

এই অনুভূতির মধ্যেও নারীর চাওয়া-পাওয়া প্রধান হয়ে উঠেছে।

৪ বলরাম দাসের কিছু বাৎসল্য রসের পদে শ্রীকৃষ্ণের বাল্যজীবন অসাধারণ মানবিক মহিমা লাভ করেছে। এখানে গোপাল ননী চুরি করে খেয়ে ধরা পড়ে গেছিল, তার শাস্তিস্বরূপ মা যশোদা তাকে দড়ি দিয়ে বেঁধে রেখেছিল। এর ফলে অভিমানাহত বালক কৃষ্ণ মাকে কিছুর মত জানান —

"বলাই খাইয়াছে ননী   মিছা করে বলে রানি
ভাল মন্দ না কর বিচার,
পরের ছাওয়াল পাইয়া   মাকে আসেন ধাইয়া
কিছু বলি দয়া নাহি তার।"

৫ 'শ্রীচৈতন্যজীবনী' কাব্যগুলিতে ও চৈতন্য নামক একজন মানুষের জীবনকে কেন্দ্র করে জীবনচরিত লেখা হল। জীবনচরিত এভাবেই মধ্যযুগের কাব্যধারায় মানবতাবাদের বীজ বপন

করল। শ্রীকৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্য চরিতামৃত' ছাড়া বৃন্দাবন দাস, লোচন দাস এবং জয়ানন্দের কাব্য প্রকৃতপক্ষে তত্ত্বনিরপেক্ষ মানুষের জীবন কাব্য হয়ে উঠেছিল, সমকালীন নবদ্বীপের পাণ্ডিত্য গর্বী ব্রাহ্মণদের অহংকার, বৈষ্ণব - শাক্ত সম্প্রদায়ের বিরোধ, সুলতানি শাসনের নানা দিক, লোকায়ত চিন্তা চর্চার ব্যাপক প্রসার, নবদ্বীপের সমৃদ্ধ এই সমস্ত ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ের কাব্য হয়ে ওঠে বৃন্দাবন দাসের গ্রন্থ। জয়ানন্দের কাব্যে জানা যায় চৈতন্যের মৃত্যুজীবনের প্রামাণ্য কথা জানা যায়, চৈতন্যের মানব - মুখী কর্মচিন্তা, চৈতন্যের আবির্ভাবেই নব্য - মানবতাবাদের পরিবেশ যা জাগরণ সৃষ্টি হয় বাংলার সমাজও সাহিত্যে,

শাক্তপদাবলী :-

শাক্তপদাবলীর কবিরা জগজ্জননী কালীমাতার উপাসক। তাদের কাব্যেও আছে তন্ত্রধর্মের বহু তত্ত্বকথা। তাঁরা বিষয় বিমুখ ছিলেন না। তাঁরা ছিলেন সংসারের মানুষ, এই কাব্যের দুটি শাখা, — ① আগমনী ও বিজয়া, ② ভক্তের আকুতি। উভয় শ্রেণীর পদেই মানব জীবনের স্বরূপকে তত্ত্বের কথা বলা হয়েছে। তবু তার অবকাশেই মানব জীবনের কথা বিশেষভাবে স্বরূপ পেয়েছে। উমা সংগীত বাঙালী ঘরোয়া জীবনের কাহিনী হয়ে উঠেছে। আগমনী ও বিজয়া গানে বাৎসল্য রসাশ্রিত মাতৃহৃদয়ের বেদনা প্রতি-ফলিত হয়েছে। এখানে আদ্যাশক্তি পরমা প্রকৃতিকে কন্যা-রূপে কল্পনা করা হয়েছে। কৈলাসপতি শঙ্করের সাথে

বিবাহ হলেও মাতা মেনকার স্নেহ হ্রাস হয় না। তিনি গিরিরাজ হিমালয়কে তাগিদ দেন তিনি যেন অবিলম্বে কৈলাসে গিয়ে কন্যা উমাকে সঙ্গে করে নিয়ে আসেন —

"যাবে যাবে বল গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে,
ব্যাকুল হইয়াছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে"।

এখানে মেনকা দেবী নন, বাঙালী মাতা। উমা ঘরে এলে তিনি জানাতে চান —

"কত দেখি উমা, কেমন ছিলে মা
ভিখারি হরের ঘরে?"

হিমালয় এখানে বাঙালী পরিবারের অলস, কর্মবিমুখ পিতা, স্বর্গীয় মাহাত্ম্য তাদের নেই। তাই 'উমাসঙ্গীত' যেন গার্হস্থ্য জীবনের কাব্য। তা আরও শাক্তআগমনী প্রমাণিত হয় মেনকার নিম্নোক্ত বক্তব্য —

"(গিরি) এবার তোমার উমা এলে আর উমা পাঠাব না,
বলে বলবে লোকে মন্দ কারো কথা শুনবো না,
যদি এসে মৃত্যুঞ্জয় উমা নেবার কথা কয় —
এবার মায়ে ঝিয়ে করব ঝগড়া জামাই বলে মানবো না"।

শাক্ত পদাবলীর ভক্তের আকুতি পর্যায়ের পদের মধ্যে মাতৃসাধনার সাথে সাথে সংসার যন্ত্রণায় জর্জরিত মানুষের কথা প্রতীক হয়ে উঠেছে। এখানে ভক্ত মাতার নিকট আত্মসমর্পণ করেছেন (অমৃত লাভের জন্য নয় সামাজিক-রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা থেকে মুক্তিলাভের উদ্দেশ্য, তাই তো রামপ্রসাদ জানান —

"কোন অবিচারে আমার পরে, করলে দুঃখের ডিক্রিজারি"

মাতের কাছে আশ্রয় চায় পুত্র কিন্তু দেখে উদ্বুখলতা, কোন্দল, অবিচার বেড়ে যায়। তাই দেবী-কে আঘাত করে কবি বলেন —

"কুপুত্র অনেক হয় মা কুমাতা নয় কখন তো";

ফলে এই কাব্য মাতা - পুত্রের কথোপকথনের কাব্য হয়ে ওঠে। মাতের প্রতি পুত্রের অভিযোগ ও আশ্রয় প্রার্থনায় ধর্মের সংকীর্ণতা নেই।

❀ আরাকান রাজসভার কাব্য :-

সপ্তদশ শতকের বাংলা সাহিত্যের ধর্মনিরপেক্ষ মানবিক উপাদানে সমৃদ্ধ সাহিত্য 'আরাকান রাজসভার কাব্য'। এই যুগের অন্যতম দুই কবি — সৈয়দ আলাওল ও দৌলত কাজী। দৌলত কাজীর অন্যতম রচনা হল 'সতীময়না' বা 'লোরচন্দ্রানী'। এটি লৌকিক প্রেমের কাব্য, ময়নালোর - চন্দ্রানী এই ত্রিমুখী প্রেমের কাহিনী এটি। প্রেমের জন্য এসেছে যুদ্ধ। যুদ্ধ জয়ী হয়ে বামনপত্নী চন্দ্রানীকে লাভ করেছেন লোর। আর লোর পত্নী ময়না অপেক্ষার আগুনে দগ্ধ হয়েছে। ময়নামতী সখী মালিনীকে জানায় —

মালিনি কি কহব বেদন তোর,

লোর বিনে বামহি বিহি ভেল মোর॥

দৌলত কাজীর কাব্য মানব জীবন নির্ভর, অসাধারন কিছু গীতিকল এই কাব্যকে মানবিক করেছে ——

ক) "যাহার মাহিক লজ্জা কি তার সম্ভ্রম

অন্তরেতে ধর্মকথা বেশ্যাকে উপদেশ॥

(৪) "জীবন যৌবন ধন না রহিব সর্বক্ষণ
অমর হইব উপকারে";

সৈয়দ আলাওলের লেখা কাব্যগুলি হল — 'পদ্মাবতী', 'হপ্তপয়কর', 'সেকেন্দার নামা', 'সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জামান' ইত্যাদি এর মধ্যে প্রথম কাব্যটি সার্থক প্রণয় আখ্যান, পদ্মাবতীকে লাভ করার জন্য রত্নসেনের দুঃসাহসিক অভিযান বর্ণনা, পদ্মাবতীর সৌন্দর্য বর্ণনা, সতীত্বরক্ষার বিবরণ অসাধারণ দক্ষতায় বর্ণিত। এইসব রচনা গুলিতে অলৌকিকতা নেই। কোন কোন স্থানে সুফী ধর্মের কথা বড় হলেও তা উদারতায় পূর্ণ।

❀ মৈমনসিংহ গীতিকা :—

অষ্টাদশ শতকের বাংলা সাহিত্যের একটা গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় 'লোকসাহিত্য', এর মধ্যে পূর্ববঙ্গের 'মৈমনসিংহ' জেলায় পাওয়া 'মৈমনসিংহ গীতিকা' অন্যতম, চন্দ্রকুমার দে এই গীতিকাটি সংগ্রহ করেন। 'মহুয়া', 'মলুয়া', 'কঙ্ক ও লীলা', 'কেলুয়াসুন্দরী' ইত্যাদি কাব্যে কখনও আবারও হৃদয়, সংস্কার ও প্রেম দ্বন্দ্বে জর্জরিত, প্রথার কাছে, আচারের কাছে, ধর্মের সংকীর্ণতার কাছে প্রেম আঘাত পেয়েছে। মহুয়া ও নদের চাঁদ প্রেমকে সফল করার জন্য ছেড়েছে ঘর, ছেড়েছে জাত, ধর্ম, সম্প্রদায়ের বন্ধন, শেষপর্যন্ত তাদের জীবনকে কেড়ে নিয়েছে হুমরা বেদের দলবল, তাদের মৃত্যু হলেও প্রেম অমরত্ব লাভ করেছে, তাইতো আমাদের কানে বারংবার ভেসে ওঠে মহুয়া ও নদের চাঁদের সেই স্বর

অতিস্মরণীয় উদ্ধারণ ——

মহুয়া — লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাইরে তর,
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর ॥

প্রত্যুত্তরে নদের চাঁদ জানায় —

কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী,
তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুব্যা মরি ॥

'মলুয়া' পালায় মলুয়া ও চাঁদ বিনোদের প্রেম আকর্ষণীয়, মলুয়ার প্রেম সমাজের অবিচারে ব্যর্থ হয়ে যায়। মলুয়ার সতীত্ব অসাধারণ। 'কঙ্ক ও লীলা' কাব্যের নায়ক – নায়িকা একে অপরের কাছে যে ভাষায় প্রেম নিবেদন করে তার কাব্য সৌন্দর্য অতুলনীয়, সর্ব প্রথমে লীলা ও কঙ্কের প্রেম ব্যর্থ, কঙ্কের বিচ্ছেদে লীলার বিরহ মর্মান্তিক হয়ে উঠেছে। করুন নিবেদন ধ্বনিত হয়েছে তার কণ্ঠে —

কহিও কহিও ঠাকুর আরে তুমি দিনমণি,
যাহার লাগিয়া আমি হইনু পাগলিনী ॥
নাগাল পাইলে তারে আমার কথা কইও,
অলোক মিলাইয়া পত্র দেশেতে আনিও ॥

উপসংহার :-

উপসংহারে বলা যায় যে, মানবতাবাদ কথাটি ইতালির 'রেনেসাঁস' জাত। বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগে এরকম কোন তীব্র সামাজিক আন্দোলন হয়নি, ফলে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদ এই ধরনের মধ্য যুগের সাহিত্যে অনুসন্ধান ভুল হবে- মনে রাখতে হবে ধর্ম এবং দেবতাই সেকালে ছিল মূল কথা। কিন্তু সেকথা বলতে গিয়েই কবিরা মানুষের জীবনকে অস্বীকার করতে পারেন নি। সেই সঙ্গে

এসেছিল মানুষের কথা। যুগ যত এগিয়ে চলে, লেখকের চেতনাও বিবর্তিত হয়। চেতনার বিবর্তন সূত্রেই শেষ পর্যন্ত 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন', 'মঙ্গলকাব্য', এবং 'মৈমনসিংহ গীতিকার' মানবজীবনরস ভিন্ন ভঙ্গি হয়ে ওঠে, সেই সঙ্গে এ কথা স্মরণযোগ্য যে ইউরোপে সামাজিক বিবর্তন যত দ্রুত হয় এ দেশে তা হয়নি, ফলে ইউরোপীয় মানবতাবাদ এর কথা ভেবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের মানবতাবাদ এর কথা ভেবে বাংলা সাহিত্যের মধ্যযুগের মানবতাবাদ এর অনুসন্ধান ঠিক নয়। এ দেশের সমাজ, মানুষের মন, ধর্মীয় চেতনার বিবর্তন, ইত্যাদির ওপর নির্ভর করেই বলা যায় এ মানবতাবাদ "দেবতানির্ভর মানবতাবাদ"।

সিদ্ধান্ত

দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা দেখলাম যে মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে কেবল মাত্র ধর্মীয় ভাবনা নয় অজস্র মানবতাবাদের নিদর্শন রয়েছে। মধ্যযুগের উল্লেখযোগ্য শাখা মঙ্গলকাব্য থেকে শুরু করে বৈষ্ণব পদাবলী, অনুবাদ সাহিত্য, জীবনী সাহিত্য, শাক্ত পদাবলী, প্রভৃতি শাখায় মানবতাবাদের সংস্পর্শে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে। যেমন — শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে রাধা-কৃষ্ণ দেব চরিত্র হলেও তাদের প্রণয় কাহিনী জীবন থেকে সমৃদ্ধ হয়েছে। মঙ্গল কাব্যে দেব-দেবীদের আচার-আচরণের মানব চরিত্রের কথাই প্রকট হয়ে উঠেছে। অন্যদিকে জীবনী সাহিত্যের ও চৈতন্যদেবকে মানব রূপে আবির্ভূত হয়েছে। অতএব আমরা বলতে পারি মানবতাবাদকে বাদ দিয়ে সাহিত্য রচনা কখনোই সম্ভব নয়।

গ্রন্থপঞ্জী

① বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (তৃতীয় খণ্ড) → মডার্ন বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড → অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় → পুনর্মুদ্রণ (2015-2016)

② সাহিত্য-প্রবন্ধ প্রবন্ধ সাহিত্য — হীরেন চট্টোপাধ্যায়, কৃষ্ণগোপাল রায়

③ প্রবন্ধ সঙ্কলন (প্রথম খণ্ড) — ড. সত্যবতী গিরি, ড. সমরেশ মজুমদার

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এই প্রকল্পমূলক কাজটি সম্পূর্ণ করতে গিয়ে যেসব ব্যাক্তির সহযোগিতা ও পরামর্শের হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের ~~কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সমস্ত~~ সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সমস্ত গ্রন্থাগারকে যেখান থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন গ্রন্থ ও নথিপত্র আমার প্রকল্প রচনার জন্য সাহায্য করেছে। এছাড়াও স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক ও অধ্যাপিকাদের তাদের পরামর্শ নির্দেশনা ও পরিচালনায় আমার এই অনুসন্ধান মূলক কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে,

DB
Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya
EXAMINED

সোমাশ্রী মাইতি
শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

শিক্ষকের/শিক্ষিকার স্বাক্ষর

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়

চতুর্থ সেমিস্টারে অন্তর্গত এস. ই . সি- টু কোর্সের জন্য উপস্থাপিত

প্রকল্প পত্র ঃ- শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্যের সামাজিকতা

শিক্ষার্থীর নাম ঃ-সঞ্জয় বর

সেমিস্টার ঃ- চতুর্থ

পত্র ঃ- এস. ই. সি -টু

রেজিস্ট্রেশন নং-২১১০৪০২৪০,২০২১-২০২২

রোল নং-১১১৪১৫২-২১০০১৯

শিক্ষাবর্ষ ঃ- ২০২২-২০২৩

Phone: 9932873484/7501133806
SWARNAMOYEE JOGENDRANATH MAHAVIDYALAYA
Govt. Aided General Degree College | Estd.: 2014
At+P.O.: Amdabad, P.S.: Nandigram, Dist.: PurbaMedinipur, PIN 721650
www.sjmahavidyalaya.in| Email: sjmahavidyalaya@gmail.com

CERTIFICATE

This is to certify that Samjoy Bera Roll: 1114152 No: 210019, Reg.No:- VU210640240 of 2021-22, a student of B.A. 4th Semester (Honours), Bengali Department, Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya for the session 2022-2023; submitted his/her project report for partial fulfillment of the syllabus of SEC-2,(CBCS) prescribed by Vidyasagar University. The project has been prepared under the supervision of Dr. Madhumita Basu and Surajit Mandal and ready to place before examiner for evaluation.

Dr. Ratan Kumar Samanta
Principal
S.J Mahavidyalaya
Principal
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad :: Purba Medinipur :: Pin-721650

Supervisors

Dr. Madhumita Basu
Assistant Professor & HOD
Department of Begali.
S.J Mahavidyalaya
Head of the Department,
Department of Bengali

Surajit Mandal
SACT-I, Department of
Bengali
S.J Mahavidyalaya
Mahavidyalaya
Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায় :

প্রসঙ্গ বিষয়ের সাধারণ আলোচনা

দ্বিতীয় অধ্যায় :

বিষয় বস্তু বিবরণ

তৃতীয় অধ্যায় :

বিষয় বিশ্লেষণ

চতুর্থ অধ্যায় :

সিদ্ধান্ত , গ্রন্থপঞ্জী , কৃতজ্ঞতা স্বীকার

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

প্রথম অধ্যায়

প্রকল্প :

কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সুপরিকল্পিত মূল্যায়নের মাধ্যমে যে কাজ সম্পন্ন করা হয় তাকে প্রকল্প বলে. এ সম্পর্কে — i) Stevenson বলেছেন A project is a problematic act carried to completion in its natural setting. অর্থাৎ যে সমস্যামূলক কাজ বা তার সুপরিকল্পিত অনুক্রমে সম্পন্ন করা হয় তাকে প্রকল্প বলে. ii) H. W. Kilpatrick - এর মতে 'A whole-hearted purposeful activity proceeding in a social environment.' অর্থাৎ প্রকল্প হল কোনো উদ্দেশ্য মূলক কাজ যা একটি সমাজের প্রত্যক্ষ অনুকূল অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পন্ন করা হয়.

প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য :

1) সমস্যা কেন্দ্রিক : প্রকল্প হয় সমস্যাকেন্দ্রিক অর্থাৎ কোনো না কোনো সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রকল্প নির্ধারিত হয়ে থাকে.

2) উদ্দেশ্য ভিত্তিক : কোনো বিশেষ উদ্দেশ্যকে কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে.

3) আন্তরিকতা : প্রকল্প মূলক কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের কাজের প্রতি আন্তরিকতা দেখা যায়.

4) সৃজনশীলতা : প্রকল্প মূলক কাজের প্রতি গিয়ে শিক্ষার্থীদের সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটতে দেখা যায়.

5) অনুসন্ধান মূলক কাজ : প্রকল্প রূপায়ণ করতে গিয়ে শিক্ষার্থীরা নানা রকমের অনুসন্ধানমূলক কাজের প্রতি গিয়ে থাকে

6) বাস্তবকেন্দ্রিক : প্রকল্প ভিত্তিক কাজ সর্বদা কোনো না কোনো বাস্তব সমস্যাকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে.

গ) সামাজিক গুণাবলির বিকাশ : প্রকল্প মূলক কাজের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সমবেদনা, এক অপরের উপর নির্ভরশীলতা ইত্যাদি সামাজিক গুণাবলি গুলি বিকশিত হওয়ার সুযোগ পায়।

প্রকল্পের প্রকারভেদ :

প্রকল্প সাধারণত দুই প্রকারের হয়ে থাকে ① একক প্রকল্প
② দলগত প্রকল্প

প্রকল্প মূলক কাজের উদ্দেশ্য :

① প্রতিটি শিক্ষার্থীকে উৎপাদন মূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করা
② ছাত্র-ছাত্রীদের মুক্তভাবে কাজ করা এবং তাদের মধ্যে দলবদ্ধতার মানসিকতার বিকাশ সাধন করা
③ ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে সহযোগীতা বোধ জাগিয়ে তোলা।
④ ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে কলমে কাজ করতে শেখানো।
⑤ ছাত্র-ছাত্রীদের সৃজনশীল প্রতিভার বিকাশ সাধন করা।

প্রকল্প মূলক কাজের উপযোগিতা :

প্রকল্প রূপায়নের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলবদ্ধভাবে কাজ করার মানসিকতা তৈরি হয়। প্রকল্প রূপায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়ার বই ছাড়াও অন্যান্য বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করতে পারে।

বিষয় বস্তু নির্বাচন :

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সামাজিকতা. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য ১৩১৬ বঙ্গাব্দে বসন্তরঞ্জন রায় বাঁকুড়াজেলা থেকে বড়ুচণ্ডীদাসের রচিত একটি প্রাচীন আবিষ্কার করেন. বাংলা সাহিত্যে এই গ্রন্থটি ও শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে খ্যাত. উল্লেখ্য এই গ্রন্থটি বনবিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা নিবাসী দেবেন্দ্রনাথ মুখো-পাধ্যায়ের বাড়ি ছিল. এই গ্রন্থটি ১৩২৩ বঙ্গাব্দে কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়.

বড়ুচণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য. এই কাব্যের কথা বস্তুর সামান্যই পুরাণ থেকে গৃহীত. অধিকাংশ কাহিনীপুরাণ বহির্ভূত দেশে প্রচলিত রাধাকৃষ্ণের কাহিনী এবং সমসাময়িক যুগের সমাজ চিত্র কবির কল্পনা জাগ্রত করেছে বেশি. এই অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে এই গ্রন্থ থেকে অনেক সামাজিক তথ্য পাওয়া যায়. সেই যুগের রীতিনীতি, লোকাচার, আচার আচরণের অনেক পরিচয় এই গ্রন্থে মিলবে. উক্ত বিষয় গুলির উপর গভীর ভাবে আলোকপাত করার জন্য আমি মধ্যযুগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সামাজিকতা বিষয়টি নির্বাচন করেছি.

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন মধ্যযুগীয় বাংলা কাব্য ১৩১৬ বঙ্গাব্দে (১৯০৯) খ্রিঃ বসন্তরঞ্জন রায় বাঁকুড়া জেলা থেকে বড়ু চণ্ডীদাসের ভণিতায় একটি পুঁথি আবিষ্কার করেন. বাংলা সাহিত্যে এই পুঁথিটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামে খ্যাত. উক্ত পুঁথিটি বনবিষ্ণুপুরের নিকটবর্তী কাঁকিল্যা নিবাসী দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের বাড়ি ছিল. এই পুঁথিটি ১৩২৩ বঙ্গাব্দে কলকাতা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়.

বসন্তরঞ্জনের নিকট থেকে জানা যায়, মূল পুঁথিটি তুলোট কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লিখিত ছিল. পাতার আকার ছিল ১৩.২৫ × ৩.৭৫ ইঞ্চি. এই গ্রন্থের দুটি পাতা পাওয়া যায়নি. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামটি বসন্তরঞ্জনের দেওয়া. এ প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের ভূমিকায় বসন্ত রায় লিখেছেন— দীর্ঘকাল যাবৎ চণ্ডীদাস বিরচিত কৃষ্ণকীর্তনের অস্তিত্ব মাত্র শুনিয়া আসিতেছিলাম. এত দিনে তার সমাধান হয়ে গেল. আমাদের বিবেচনায় (আলোচ্য) পুঁথিটিই কৃষ্ণকীর্তন এবং সেইহেতু ইহার অনুরূপ নাম নির্দেশ করা হল.

বসন্তরঞ্জনের এই গ্রন্থ আবিষ্কারের পূর্বে এই গ্রন্থ সম্বন্ধে জানা গিয়েছিল, ১২৮০ বঙ্গাব্দে প্রকাশিত জগবন্ধু ভদ্রের সম্পাদিত মহাজন পদাবলী (প্রথম খণ্ড) পুঁথি ৪৬ থেকে জানা যায় ১৩১১ বঙ্গাব্দে ব্রজসুন্দর সান্যাল কর্তৃক চণ্ডীদাস রচিত গ্রন্থ এবং ত্রৈলোক্যনাথ ভট্টাচার্যের কৌতুক প্রবন্ধ (নবজীবন, ফাল্গুন ১২৯৩) এই গ্রন্থের নাম জানা যায়. যদিও গ্রন্থ নামটি কৃষ্ণকীর্তন নামক গ্রন্থটিকে বসন্তরঞ্জন রায়ের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, এ কথা সন্দেহাতীত ভাবে বলা যায় না. ডঃ বিমান বিহারী মজুমদার এবং ডঃ অসিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এই গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-এর পরিবর্তে শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ হওয়া উচিত বলে দাবি করেছেন.

বর্তমান মুদ্রণ ও পুনর্মুদ্রণের সময় এবং টীকা ও সম্পাদকের মধ্যযুগীয় পুঁথির প্রতি ভক্তি বানানের জন্য সম্যক ভুল বানানের জন্য কোন কিছু বোঝার সমস্যা দেখা গেছে. বা বিশেষত: যাদের মূল পুঁথিটি দেখার সৌভাগ্য হয়েছে. তারা সাহায্য করলে এই ত্রুটিগুলি নিরসন করা সম্ভব হবে.

পুঁথির নামকরণ :

বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' শিরোনামে একটি সম্পাদনা ও প্রকাশ করলেও এই গ্রন্থের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' নামকরণ নিয়ে যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। প্রাচীন পুঁথিগুলিতে সাধারণত প্রথম বা শেষ পাতায় পুঁথির নাম লেখা থাকে কিন্তু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পুঁথির ক্ষেত্রে এই দুটি গুরুত্বপূর্ণ পৃষ্ঠা পাওয়া যায়নি ফলে পুঁথির নামও অজানাই থেকে যায়। এমনকি পরবর্তী কালের কোনোও পুঁথিতে ও বড়ু চণ্ডীদাস বা তাঁর গ্রন্থের কোনোও উল্লেখ পাওয়া যায় না। বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় তাই নামকরণ কালে পুঁথির কাহিনি বিচার করে লোক শ্রুতি অনুসারে এটি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাম প্রকাশ করেছিলেন. তাঁর বক্তব্য ছিল → পুঁথির আদ্যন্তহীন খণ্ডিতরূপে কবির জন্মকালাদির কথা দূরে থাকুক, পুঁথির নাম পর্যন্ত ও পাওয়া যায় নি. কথিত হয় চণ্ডীদাস কৃষ্ণকীর্তন গান রচনা করেন. বৈষ্ণবীয় এক বাশুলি উৎসবে চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলা গীত হয়েছিল. অন্য কীর্তি নাই. আলোচ্য পুঁথির প্রতিপাদ্য যে শ্রীকৃষ্ণের লীলাকীর্তন, তাহাতে সন্দেহের অবসর নেই. অতএব গ্রন্থের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামকরণ অসমীচীন নয়.

প্রকাশকালের প্রায় ৩১ বছর পর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় রমেশ বসু সম্ভবত শ্রীকৃষ্ণকাব্যের নামকরণ কেন্দ্রিক বিতর্কের সূত্রপাত ঘটান. তারপর বাংলা সাহিত্যের সুধীসমাজ এ-নিয়ে তুমুল তর্কবিতর্কে লিপ্ত হয়. যারা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নামকরণের বিরোধী ছিলেন তাদের যুক্তি ছিল ত্রিমুখী. প্রথমত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন একটি আদিরসাত্মক অশ্লীল কাব্য — এতে শ্রীকৃষ্ণমাহাত্ম্যের উপস্থিতি নেই. দ্বিতীয়ত পুঁথির মধ্যে যে চিরকুটটি পাওয়া যায়, তাতে 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ' নামে একটি কথা লিখিত আছে. অনেকে মনে করেন গ্রন্থের মূল নাম 'শ্রীকৃষ্ণসন্দর্ভ'. প্রথম যুক্তিটি অমূলক কেননা ভক্তের দৃষ্টিতে শুধুই দূষণ কিন্তু আধুনিক গবেষকগণ দ্বিতীয় যুক্তিটি সম্পর্কেও যথেষ্ট সন্দিহান. তবে অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন — যতদিন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের যথার্থ নাম আবিষ্কৃত না হয় ততদিন সম্পাদক বসন্তরঞ্জনকৃত বিদ্বদ্বল্লভ প্রদত্ত এই নামটিই স্বীকার করতে হবে.

বসন্তবাবুর পুঁথিতে নাম ছিলনা, তিনি নিজেই এর নাম দিয়েছিলেন 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন'. বইটির মুখবন্ধে লিখছেন —

আগে সম্পাদকের বিবৃতি: বসন্তরঞ্জনের আবিষ্কৃত পুঁথিটি খণ্ডিত ছিল তার প্রথম দুটি পাতা ছিল না, শেষের পাতাগুলি মেলেনি.

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি

বড়ু চণ্ডীদাস যদিও শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি সম্পর্কে আজও অনেক বিতর্ক আছে, কেননা কবির বিভিন্ন পুঁথিতে দেখতে পাই আত্ম পরিচয়েই, তাঁর পরিচয়ের সূত্র এবং ভণিতায় উল্লেখ —

① গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণ,

② বাসলী শিরে বন্দি গাইল চণ্ডীদাস,

③ গাইল অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস দেবী বাসলীগণে,

যেমন প্রায় সব স্থানেই ভণিতা মিলেছে বড়ু চণ্ডীদাস নামে (২৯৮ বার) চণ্ডীদাস মিলেছে সেই একশোর (১০৭ বার) আর মাত্র সাতটি স্থানে অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতা আছে বর্তমান পণ্ডিত বা গবেষকগণ। আবিষ্কৃত ভণিতাতেই বাসলী নামের উল্লেখ দেবীর নামও বর্তমান আছে, এই অনুমান করা হয় যে উপাস্য দেবীর নাম বাসলী, যদিও তাঁর প্রকৃত নাম, জন্মস্থান বা বাসস্থান নিয়ে মতভেদ বিস্তর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন নাম নিয়েও মতভেদ যথেষ্ট।

রচনা কাল :

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের রচনাকাল নিয়েও রয়েছে সমস্যা. তবে কিছু হলেই-রচনাকাল সম্পর্কে মতান্তর. ড: মুহম্মদ শহীদুল্লাহর মতে এর রচনাকাল - ১৪০০ খ্রিস্টাব্দ.

উৎস ও সম্পাদনপর্ব :

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে পৌরাণিক কাহিনীর মিশ্রণ রয়েছে. তবে পৌরাণিক প্রভাব অল্প. লৌকিক প্রভাবই বেশি. তার সাথে জয়দেবের প্রভাব. কাহিনী পরিকল্পনায় ও চরিত্র সৃষ্টিতে ধর্মমঙ্গলের প্রভাব বিদ্যমান. মূলতঃ সং-মিশ্রণ কাহিনীর উপর রচিত লৌকিক কাব্য.

চরিত্র :

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের প্রধান চরিত্র তিনটি —

রাধা
কৃষ্ণ
বড়াই

খণ্ড :

চতুর্দশ শতকের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য বাংলা সাহিত্যের প্রথম আখ্যান কাব্য. প্রথম কাহিনী কাব্য. এই কাহিনীটি মোট ১৩ টি খণ্ডে বিভক্ত. ① জন্মখণ্ড ② তাম্বুল খণ্ড ③ দান খণ্ড ④ নৌকাখণ্ড ⑤ ভার খণ্ড ⑥ ছত্র খণ্ড ⑦ বৃন্দাবন খণ্ড ⑧ কালীয়দমন খণ্ড ⑨ বস্ত্রহরণ খণ্ড ⑩ হার খণ্ড ⑪ বাণখণ্ড ⑫ বংশীখণ্ড ⑬ রাধাবিরহ.

পুঁথি আবিষ্কার :

১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে (১৩১৬ বঙ্গাব্দে) বাঁকুড়া জেলার বেলিয়াতোড় গ্রামের অধিবাসী বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর মহকুমার নিকটবর্তী কাঁকিল্যা গ্রামে দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের (বিষ্ণুপুর রাজগুরু বৈষ্ণবাচার্য শ্রীনিবাস আচার্যের দৌহিত্র বংশধর) বাড়ির গোয়াল ঘরের মাচা থেকে পুঁথিটি পান.

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের সামাজিকতা

ভূমিকা:

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য. এই কাব্যের কথা বস্তুর সামান্যই পুরাণ থেকে গৃহীত. অধিকাংশ কাহিনী পুরাণ বহির্ভূত দেশে প্রচলিত রাধা-কৃষ্ণের কাহিনী এবং সমসাময়িক যুগের সমাজচিত্রে কবির কল্পনা জাগ্রত করেছিল. এই অভিনিবেশ সহকারে পাঠ করলে এই গ্রন্থ থেকে অনেক সামাজিক তথ্য পাওয়া যায়. সেই যুগের রীতিনীতি, বেশভূষা, আচার-আচরণের অনেক পরিচয় এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ.

সমাজচিত্র

দেশে তখন শ্রীরামচন্দ্রের পূজা প্রচলিত ছিল. শুভ কোনো কাজ আরম্ভ করার আগে তাঁর বন্দনা করা হত. লোকেরা মনস্কামনা সিদ্ধির আশায় চণ্ডী দেবীর পূজা করত. শুভ কাজ আরম্ভ করার পূর্বে শুভ তিথি, বার, লগ্ন বিচার করা হত. অভীষ্ট সিদ্ধি করার কামনায় দানধ্যান করত. অকালমৃত্যু দিয়ে লোকেরা পাপের প্রায়শ্চিত্ত করত. গলায় কলসি বেঁধে জলে ডুবে, আগুনে ঝাঁপ দিয়ে, বিষ খেয়ে কিংবা গলায় পাথর বেঁধে জলে ঝাঁপ দিয়ে আত্মহত্যার রীতি ছিল. সংসার আসক্তিহীন নারী মাথা মুড়িয়ে যোগিনী সেজে নানা স্থানে ও তীর্থ স্থানে যেত. জন্মান্তর, কর্মফল ও অদৃষ্ট প্রভৃতিতে সে যুগের মানুষের গভীর বিশ্বাস ছিল. মন্ত্রতন্ত্রে লোকের গভীর বিশ্বাস ছিল. রাধিকে বশ্যঃ বীজমন্ত্র আদি ও নিদ্রামন্ত্র দ্বারা সংজ্ঞাহীন করার দৃষ্টান্ত তার প্রমাণ.

তখন সমাজে বাল্য বিবাহ প্রচলিত ছিল, ব্যক্তি বা পরিবারের মে তেমর এবং ছেলের রীতি প্রচলিত ছিল. কোন রমণীকে দরিদ্রের অথবা আত্মীয় জীবিকা সংস্থানের জন্য হাটে বিক্রি করতে হত.

সে যুগের সংস্কার গুলিও অতি অদ্ভুত দাস জাত ভুলে বিরেছিল, লোকে বলে হাঁচি ও টিকটিকির এবং বিড়ালের প্রবৃত্তিতে চলা হত. তাছাড়া শূন্য কলসী দেখে কোথাও যাত্রা. দক্ষিণ দিকে কুলালের গমন. মুখে ভাল উচ্চারিত নামের এবং হাতে দড় - কলার বিয়ে মোড়ান্তীয় কিন্তু প্রথা প্রভৃতি ছিল অশুভের সংকেত বস্তু, যাদ আসন্ন মুমূর্ষু রুগী শিখিতে গঙ্গিতলা জলের মধ্যে বসিয়ে দিত নেওয়া হত, এর তলসীতে হাত তুলে. মৃত্যুর আগে তিনি জল মনম - বিসর্জনীর দান দিয়ে লাগানো শিখা অকল্যাণ দূর হবে, এই সংস্কার প্রবল ছিল.

নারীহত্যা তখন সমাজে অত্যন্ত নিন্দনীয় ও ঘৃণিত অপরাধ ছিল. নারী হত্যা মানে সর্বাপেক্ষা পাতকের কর্ম. নারী হত্যাকারী ব্রহ্মহত্যার চেয়েও অধিক পাপী. নারী হত্যাকারী ব্যক্তির সাতপুরুষ অধঃপতিত হতো না. নারী হত্যাকারী ব্যক্তির সাতপুরুষ অধঃপতিত থাকত, — এরূপ লোক বিশ্বাস প্রচলিত ছিল. অবস্থাপন্ন গৃহস্থের বধূরা গজমতি হার, কুণ্ডল, নেকলেস, কণ্ঠি, রত্নখচিত কেয়ূর, চুড়ি, আংটি প্রভৃতি বিবিধ অলংকার পরিধান করত, অলংকার ও পোশাক - পরিচ্ছদ ছিল বৈচিত্র্যপূর্ণ. শ্রীপুরুষের সোনা, হীরা, মানিক, মুক্তা, গজমতি প্রভৃতির উল্লেখ এত বেশি যে লোকের অবস্থা সচ্ছল না হলে তাদের পক্ষে এগুলি পরা সম্ভব হত না.

সাহিত্যে যেকোনো লেনদেন কড়ি দ্বারা নির্বাহ হত. হাটে পণ্য বিক্রয়কারীকে মূল্য দিতে হত. পারাপারের জন্য ঘাটোয়াল নদীতে নৌকা চালাত ফলে, মাঝিকে পারাপারের জন্য মূল্য দিতে হত. বাজার হাট নিয়ে সেই লেখার ধারণা ছিল. ব্যবসাটি তেমন নিয়মিত ছিলনা. দস্যুতস্করের উপদ্রব ছিল.

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে যেমন. কৃষিজ, স্বর্ণ হাতা তৈরি, কামার, মালাকার নাপিত, কুম্ভকার তেলি মাঝি প্রভৃতি বৃত্তিজীবী জাতির উল্লেখ রয়েছে.

শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে এই সব বর্ণনা থেকে তৎকালীন সমাজের অবস্থার মোটামুটি একটা ধারণা করা যায়.

সিদ্ধান্ত

দীর্ঘ আলোচনার পর আমি দেখলাম যে মধ্যযুগে শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের সমাজচিত্রে আমাদের সামনে তুলে ধরে বড়ু চণ্ডীদাস বিভিন্ন চরিত্রের মাধ্যমে দিয়েছেন, সেই সঙ্গে সমাজের বিভিন্ন দিকের ছবিও তুলেছেন. যেমন— দৈব নির্ভর যুগ সমাজ নানাবিধের দেবদেবীর পূজা, সমাজে বাল্য বিবাহ, আত্মহত্যার রীতি. নৌপথ যোগাযোগ ব্যবস্থা, পথঘাটে দস্যুভয়, সমাজে প্রেম, ব্যক্তির কৃষ্ণ, সাজগোজ, নারীত্ব, স্বাধীনতা, প্রভৃতি ব্যাপারে দেখা যায়, নারী হত্যাকারীকে তৎকালীন সমাজ অত্যন্ত নিন্দনীয় ও গুরুতর অপরাধ বলে চিহ্নিত হত. হাটে ঘাটে বিক্রেতাদের শুল্ক দিতে হত এবং সাধারণ, সংসার আসক্তিহীন নারী মাথা মুড়িয়ে যোগিনী সাজ ধারণ করে ঘুরে বেড়াত, অবস্থাপন্ন গৃহস্থ বধূদের প্রসাধন ও পোশাক পরিচ্ছদ ছিল জৌলুসপূর্ণ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সোনা, হীরে, মানিক, মুক্তা, গজমতি ইত্যাদির উল্লেখ সমকালীন আর্থিক সচ্ছলতার সংকেতবাহী.

গ্রন্থপঞ্জী

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন সমগ্র — অমিত্রসূদন ভট্টাচার্য
(পুঁথি আলোচনা: সম্পাদিত)

শ্রীকৃষ্ণ কীর্তন কাব্য — ড. শিশির কুমার সিংহ.
(কেবি. পুঁথি সমন্বয়)

বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস — ড. শ্রীমন্ত কুমার জানা
(প্রাচীন ও মধ্যযুগ)

প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৪
দ্বিতীয় সংস্করণ: আগস্ট, 2000
তৃতীয় সংস্করণ: আগস্ট 2002
চতুর্থ সংস্করণ: নভেম্বর, 2006
পুনর্মুদ্রণ: জুন 2009
পুনর্মুদ্রণ: আগস্ট 2014

মুদ্রক: ইউরেকা
৩২-এ বৈঠকখানা রোড কলকাতা - ৭০০০০৯

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এই প্রকল্প মূলক কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়ে যে সব ব্যক্তি সহযোগীতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন তাদের সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই. কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সমস্ত গ্রন্থাকার কে যাদের থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন গ্রন্থ ও নথিপত্র আমার প্রকল্প রচনার ক্ষেত্রে সাহায্য করেছে. এছাড়া স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, অধ্যাপিকাদের তাদের পরামর্শ, নির্দেশ ও পরিচালনায় আমার এই অনুসন্ধান মূলক কাজটি সফল হয়েছে.

EXAMINED

[External]

শিক্ষক / শিক্ষিকার স্বাক্ষর

শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

সঞ্জয় কর

Department of Bengali

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়

স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়

চতুর্থ সেমিস্টারের অন্তর্গত এস ই সি -টু কোর্সের জন্য উপস্থাপিত

প্রকল্প পত্র :-বলাকা কাব্যের বিষয়বস্তু

শিক্ষাথীর নাম :- শ্রাবনী জানা

সেমিস্টার :-চতুর্থ

পত্র -এস ই সি -টু

রেজিস্ট্রেশন নং -২১১০৪০২৪৪,২০২১-২০২২

রোল নং :-১১১৪১৫২-২১০০২১

শিক্ষাবর্ষ :২০২২-২০২৩

Phone: 9932873484/7501133806

SWARNAMOYEE JOGENDRANATH MAHAVIDYALAYA

Govt. Aided General Degree College | Estd.: 2014

At+P.O.: Amdabad, P.S.: Nandigram, Dist.: PurbaMedinipur, PIN 721650

www.sjmahavidyalaya.in| Email: sjmahavidyalaya@gmail.com

CERTIFICATE

This is to certify that ------Shrabani Jana------ Roll: 1114152------ No: 210021, Reg.No:- ------------------------ of ----------------------, a student of B.A. 4th Semester (Honours), Bengali Department, Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya for the session 2022-2023; submitted his/he. project report for partial fulfillment of the syllabus of SEC-2.(CBCS) prescribed by Vidyasagar University. The project has been prepared under the supervision of Dr. Madhumita Basu and Surajit Mandal and ready to place before examiner for evaluation.

Supervisors

....

Dr. Ratan Kumar Samanta
Principal
S.J Mahavidyalaya

Principal
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad :: Purba Medinipur :: Pin-721650

....

Dr. Madhumita Basu
Assistant Professor & HOD
Department of Begali.
S.J Mahavidyalaya

Head of the Department,
Department of Bengali
Swarnamoyee Jogendranath Mahavidyalaya
Amdabad, P.S. Nandigram, Pin-721650

....

Surajit Mandal
SACT-I, Department of
Bengali
S.J Mahavidyalaya
Mahavidyalaya

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

সূচিপত্র

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya

ক) প্রকল্প কাকে বলে?

⇒ কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য সু-পরিকল্পিত মূল্যায়নের মাধ্যমে যে কাজ সম্পাদন করা হয় তাকে প্রকল্প বলে।

★ প্রকল্পের বৈশিষ্ট্য গুলি কী কী?

প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যগুলি হল :—

i) সমস্যাকেন্দ্রিক :-

প্রকল্প হল সমস্যাকেন্দ্রিক অর্থাৎ, কোনো না কোনো সমস্যাকে কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

ii) উদ্দেশ্যভিত্তিক :-

কোনো বিশেষ উদ্দেশ্য করে বা কেন্দ্র করে প্রকল্পের কাজ সম্পাদিত হয়ে থাকে।

iii) সৃজনশীলতা :-

প্রকল্পের কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীর সৃজনশীলতার প্রকাশ ঘটে।

iv) অভিনবত্ব :-

প্রকল্পমূলক কাজ সম্পাদন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর কাজের মধ্য দিয়ে অভিনবত্ব দেখা যায়।

v) অনুসন্ধানমূলক কাজ :-

প্রকল্প করতে গিয়ে শিক্ষার্থীর নানারকমের অনুসন্ধানমূলক কাজের মধ্য দিয়ে শেখে।

vi) মানুষকেন্দ্রিকতা :—

প্রকল্প ভিত্তিক কাজ সর্বদা কোনো না কোনো মানুষ সমস্যাকে কেন্দ্র করে হয়ে থাকে।

vii) প্রকল্প সংক্রান্ত কাজের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীরা নিজেদের মধ্যে সহযোগিতা, সহমর্মিতা, সমবেদনা, একে অপরের প্রতি নির্ভরশীলতা, ইত্যাদি সামাজিক গুণাবলী গুলি বিকশিত হওয়ার সুযোগ পেয়ে থাকে।

(ঘ) প্রকল্প কয়প্রকার ও কী কী?

প্রকল্প সাধারণত দুপ্রকার, যথা :— i) একক প্রকল্প
ii) দলগত প্রকল্প

(ঙ) প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি কী কী?

⇒ প্রকল্পের উদ্দেশ্যগুলি হল :—

i) প্রতিটি শিক্ষার্থীকে উৎপাদনমূলক কাজের সঙ্গে যুক্ত করা। শিক্ষার্থীদের শৃঙ্খলাবোধ করা এবং তাদের দক্ষ করা। মানসিক বিকাশ সাধন করা।

ii) শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগতভাবে কাজ করার মানসিকতা বৃদ্ধি হবে।

iii) প্রকল্প রূপায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়ার বইয়ের বাইরে গিয়ে নিজস্ব জ্ঞান অর্জনের সুযোগ পায়।

(১) প্রকল্পমূলক কাজের উপকারিতা কী?

i) প্রকল্প রূপায়নের মধ্য দিয়ে শিক্ষার্থীদের পর্যবেক্ষন ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।

ii) শিক্ষার্থীদের মধ্যে দলগত ভাবে কাজ করার মানসিকতা বৃদ্ধি পায়।

iii) প্রকল্প রূপায়ন করতে গিয়ে শিক্ষার্থীদের পড়ার বইয়ের বাইরে গিয়ে নিজস্ব জ্ঞান অর্জনে সুযোগ পাওয়া যায়।

(২) প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা কী?

বর্তমানে প্রতিযোগিতামূলক আধুনিক বিশ্বের প্রতিটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের অগ্রগতির জন্য প্রকল্পের গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রতিটি দেশে যেমন অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য সামগ্রিক অগ্রগতির দিকে বিশেষ নজর দিচ্ছে। তার-ই অঙ্গ হিসেবে উন্নয়ন পরিকল্পনার সামাজিক উন্নয়নের জন্য বিভিন্ন ধরনের প্রকল্প গ্রহন করা হয়ে থাকে। এবং সেই প্রকল্প সমূহে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সম্পদ বিনিয়োগ করা হয় যাতে জাতীয় উন্নয়ন অব্যাহত থাকে।

বিষয়বস্তু নির্বাচন

রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট কাব্যগ্রন্থ 'বলাকা' এই কাব্যে কবির অনুভূতিতে গতির সুর অনুভব করা যায়। বিশ্বের সকল সৃষ্টি ও স্থিতির মধ্যে গতির ক্রিয়ার কথা বলেছেন, 'বলাকায়' কবি এই নতুন ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। নিখিল বিশ্বের মধ্যে অবিরাম গতিবেগ অনুভূতি লক্ষ করা যায়। 'ছবি', 'চঞ্চলা', 'বলাকা' প্রভৃতি কবিতাগুলির মধ্যে। যৌবনের আহ্বান রয়েছে - 'সবুজের অভিযান', 'ঝড়ের খেয়া' প্রভৃতি কবিতায়। অসীমের লীলা রহস্যের অনুভূতির কথা আছে তারি 'প্রেমের পরশ', 'তুমি- আমি' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে। 'বলাকা' কাব্যে রবীন্দ্রনাথ তাঁর বিভিন্ন কবিতায় গতি বাদের কথাই বার - বার ধ্বনিত হয়েছে। উক্ত বিষয়গুলির উপর গভীরভাবে আলোচনা করার জন্য আমি বলাকা কাব্যের বিশিষ্ট বিষয়টি নির্বাচন করেছি।

রবীন্দ্র কাব্যধারায় 'বলাকা'র বিশেষত্ব :-

ভূমিকা:- বাংলা সাহিত্যে রবীন্দ্রনাথ বিচিত্র প্রতিভা, কাব্য সাধনার আশ্চর্য সাহিত্যের তিনি সাহিত্যের নানাদিকে তাঁর প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন। সাহিত্যের এমন কোনো দিক নেই, চিন্তার এমন কোনো শাখা নেই যা নতুন নতুন সৃষ্টিতে রবীন্দ্র-প্রতিভার স্পর্শে সমৃদ্ধ বা আলোকিত হয়ে ওঠেনি। কবিতা, গল্প, উপন্যাস, নাটক, প্রবন্ধ, ভ্রমণকাহিনী, সংগীত, নৃত্যনাট্য, চিঠিপত্র প্রভৃতি রচনার মধ্য দিয়ে তিনি নতুন নতুন ভাবনার সৃষ্টি করেছেন। তিনি মানুষের আত্মমর্যাদা ও সুস্থ জীবনবোধকে গুরুত্ব দিয়েছেন তাঁর সমস্ত লেখায়। রবীন্দ্রনাথের তত্ত্বাত্মভাবনার পর্যালোচনা করলে 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য', 'গীতালি', 'বলাকা', 'পলাতকা' প্রভৃতি অসংখ্য কাব্য জীবনের অন্তিমকাল পর্যন্ত লিখেছেন। রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থগুলি বিভিন্ন পর্বে ভাগ করা যায়। পর্বগুলি নিম্নে আলোচনা করা হল।

① সূচনাপর্ব (১৮৭১ – ১৮৮১) খ্রিঃ

এই পর্বের রচনাগুলি হল:— 'বনফুল' (১৮৭২)
'কবিকাহিনী' (১৮৭৮)
'ভগ্নহৃদয়' (১৮৮১)
প্রভৃতি।

এই পর্বের কবিতায় বিহারীলাল চক্রবর্তী, অক্ষয়চন্দ্র চৌধুরী, প্রমুখ কবির রচনার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।

২. উন্মেষ পর্ব (১৮৮২ – ১৮৮৬) খ্রিঃ

এই পর্বের কাব্যগুলি হল :- 'সন্ধ্যাসংগীত' (১৮৮২) খ্রিঃ
'প্রভাতসংগীত' (১৮৮৩)
'ছবি ও গান' (১৮৮৪)
'কড়ি ও কোমল' (১৮৮৬)
প্রভৃতি।

৩. ঐশ্বর্য পর্ব (১৮৯০ – ১৮৯৬) খ্রিঃ

এই পর্বের কাব্যগুলি হল :- 'মানসী' (১৮৯০) খ্রিঃ
'সোনার তরী' (১৮৯৪)
'চিত্রা' 'চৈতালী' (১৮৯৬) প্রভৃতি।

৪. অন্তবর্তী পর্ব (১৯০০ – ১৯১০) খ্রিঃ

এই পর্বের কাব্যগুলি হল :- 'কথা' (১৯০০) খ্রিঃ
'নৈবেদ্য' (১৯০২)
'স্মরণ' (১৯০৩)
'খেয়া' (১৯১০)

৫. গীতাঞ্জলি পর্ব (১৯১০ – ১৯১৫) খ্রিঃ

এই পর্বের কাব্যগুলি হল :- 'গীতাঞ্জলি' (১৯১০) খ্রিঃ
'গীতিমাল্য' (১৯১৪)
'গীতালি' (১৯১৫)

এই পর্বে রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ভক্তিচেতনার প্রকাশ ঘটেছে।

৬. বলাকা পর্ব (১৯১৬ – ১৯২৯) খ্রি:

এই পর্বের রচনাগুলি হল :- "বলাকা" (১৯১৬) খ্রি:
"পলাতকা" "শিশু ভোলানাথ" (১৯২২)
"পূরবী" (১৯২৫) "মহুয়া" (১৯২৯) খ্রি:
প্রভৃতি।

এই পর্বে মুক্তক ছন্দে কবির গতিতত্ত্ব ও যৌবনতত্ত্বের প্রকাশ ঘটেছে।

৭. পুনশ্চ পর্ব বা গদ্যকবিতার পর্ব (১৯২৯ – ১৯৩৬) খ্রি:

এই পর্বের রচনাগুলি হল :- "পুনশ্চ"
"শেষসপ্তক"
"পত্রপুট"
"পরিশেষ"
"শ্যামলী" প্রভৃতি।

৮. অন্ত্যপর্ব (১৯৩৬ – ১৯৪১) খ্রি:

এটি রবীন্দ্র কাব্যগ্রন্থের শেষপর্ব। এই পর্বের রচনাগুলি হল :—
"প্রান্তিক" (১৯৩৮) খ্রি:
"আকাশপ্রদীপ" (১৯৩৯) খ্রি:
"নবজাতক" (১৯৪০)
"আরোগ্য" (১৯৪১)
"সানাই" (১৯৪০)
"সেঁজুতি" (১৯৩৮)
"রোগশয্যায়" (১৯৪০)
"জন্মদিনে" (১৯৪১) প্রভৃতি, এই পর্বের উল্লেখযোগ্য রচনা। জীবনসায়াহ্নে উপনীত কবির জীবন মৃত্যু ও বিশ্বলোক সম্বন্ধে গভীর উপলব্ধি প্রকাশ করেছেন।

☐ 'বলাকা' রবীন্দ্রনাথের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ কাব্যগ্রন্থ। 'বলাকা' ১৯১৬ সালে গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। তিনি তাঁর কবিতায় প্রকৃতি, প্রেম, আধ্যাত্মিক ভাবনা, মৃত্যুচেতনা, জীবনদেবতা, গতিতত্ত্ব ইত্যাদি বিষয়ে মনের তুলিতে সুনিপুণ হাতে এঁকেছেন। তাই বলা যায়, বাংলা কাব্যে রবীন্দ্রনাথের অবদান অপরিসীম।

'বলাকার পূর্ববর্তীকালে কবির মানসিকতা :-

রবীন্দ্র প্রতিভার বিকাশ অতি পরিণত ধীর প্রকৃতি। গাছ যেমন ধীরে ধীরে বাড়ে, ফুলে-ফলে নিজেকে সমৃদ্ধ করে, তেমনি রবীন্দ্র প্রতিভার পরিণতিও তেমনি ও ধীর। একদিন হঠাৎ আবির্ভূত হয়ে তিনি সকলকে চমকে দেননি। প্রকৃতির নিয়মে তিনি ধীরে ধীরে যে প্রতিভার বিকাশ বিস্তার লাভ করে। সেইভাবে তিনি ফুলে-ফলে নিজেকে বিকশিত করে নেছেন।

☐ সে বৃহত্তর জীবনের প্রবেশমুখে 'প্রভাতসংগীত' রচনা করেছিলেন, সেই কিশোরজীবনের মধ্যে কবিমনের নিবিড় পরিচয় ধীরে ধীরে ফুটে উঠল 'ছবি ও গানের' মধ্য দিয়ে. এর কিছুদিন আগে কারোয়ারের সমুদ্রতীরে এসে কবি 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' নামে একটি কাব্য নাটিকা রচনা করেছিলেন, 'ছবি ও গান' ও ঠিক এই কথার রেখায় টানা ছবি। এই রচনাগুলি আরম্ভ হয়েছিল কারোয়ারের সমুদ্রতীরেই।

◻ 'ছবি ও গানের' অন্তর্গত কবিতা কবি বাইরে যা কিছু দেখেছি তা কথার রেখায় এঁকে এক-একটি ছবি রচনার চেষ্টা, কবির নতুন স্বাতন্ত্র্য চৈতন্যের প্রথম ঝিলিমিলি। প্রকাশের ভঙ্গিমায় নতুনত্ব নয়, ছন্দকৌশলের দিক থেকে কবি নতুন মুক্ততা অর্জন করেছিলেন। সমস্ত উচ্ছ্বসিত আনন্দ ও কবিতাগুলির মধ্যে লক্ষ করা যায়। উনিশ বছর আগে প্রমথ চৌধুরীর কাছে একটি পত্রে 'ছবি ও গান' সম্বন্ধে লিখেছিলেন:—

"আমার 'ছবি ও গান' আমি কী পাগল হয়ে লিখেছিলাম। তোমার চিঠি পড়ে বোঝা গেল তুমি সেটি সম্পূর্ণ বুঝতে পেরেছ, এবং মনের মধ্যে হয়ত অনুভব করেছ। আমি সত্যিই পাগল হয়েছিলাম।

আমার সমস্ত শরীরে মনে নবযৌবন যেন একেবারে হঠাৎ বন্যার মত এসে পড়েছিল। ----- কেবলি একটা সৌন্দর্যের পুলক, তার মধ্যে পরিণাম কিছু ছিল না। ------ সত্যি কথা বলতে কি; সেই নবযৌবনের নেশা এখনও আমার হৃদয়ের মধ্যে লেগে রয়েছে। 'ছবি ও গান' পড়তে পড়তে আমার মন যেমন চঞ্চল হয়ে ওঠে। তেমন আমার কোনো পুরোনো লেখায় হয় না", -----

◻ কবি চিরকাল প্রেম, যৌবন ও সৌন্দর্যের পূজারী, কিন্তু সে যৌবন প্রবাহিত বাসনাকামনা। সেই যৌবনের পরিচয় পাই — 'কড়ি ও কোমল' কাব্যগ্রন্থ থেকে শুরু করে 'চিত্রা' পর্যন্ত। তবে সুখ: হোক, দুঃখ হোক কোনো ভাবনা ও অনুভূতি কবিকে দীর্ঘদিন বেঁধে রাখতে পারে না। তিনি যে তা ভুলে যান তা নয়, কিন্তু তাঁর কবিমন

তাকে অতিক্রম করে যায়। কবি-জীবনে কোন অবস্থাতেই চরম-পরম বলে স্বীকার করেন না। উত্তর জীবনেও স্মৃতিলোক বার-বার কবিকে পীড়িত আঘাত করেছে। 'কড়ি ও কোমল'-এর কবিতাগুলিতে বার বার পিছনে টেনে ফেলে দিতে চেয়েছে। "কড়ি ও কোমল" সেইজন্য জীবনের বিচিত্রতার সন্ধান পাওয়া যায়।

□ উত্তরজীবনে কবি 'সোনার তরী', 'চিত্রা', 'চৈতালি'-তে আমরা দেখি

কবির সমস্ত রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গি অধিমনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। দীর্ঘ অভিসারের পর বার-বার তিনি যেখানের তীরে এসে দাঁড়িয়েছেন কিন্তু প্রত্যক্ষের প্রতি দেহভোগাকাঙ্ক্ষাতে বড়ো সৌন্দর্য ভোগাকাঙ্ক্ষার প্রতি পরিতৃপ্ত করে দিয়েছেন। বস্তুদেহ ও ভাবদেহের প্রতি বিলীন হয়ে গেছে। এই রোম্যান্টিক দৃষ্টিভঙ্গির একটি দিক 'কড়ি ও কোমল'-এর কয়েকটি কবিতাতে দেখা যায়। কবির চিত্ত-বিরহীমন বধূলতার বন্ধনে প্রথম মিলনের মধ্যেও যেন অতৃপ্ত থেকে যায়। একটা উদাসীন যেন কবিমনকে তাড়া করে বেড়ায় বাসনার ফাঁদ থেকে মুক্তি পেতে চান। কবির আত্মপ্রতিষ্ঠা ও আত্মপ্রত্যয়, লাভ ঘটল 'মানসী'-তে। 'মানসী'-তে তিনি সর্বপ্রথম নিজের ক্ষমতা সম্বন্ধে সচেতন হলেন। তাঁর উজ্জ্বল কবি প্রতিভার স্বাক্ষর প্রকাশ করা গেল। কি প্রেম, কি নিসর্গ, সব কিছুতেই রবীন্দ্রনাথের যে বিশেষ দৃষ্টি-ভঙ্গি তা এই সময় থেকে একটি সুনির্দিষ্ট রূপ লাভ করল। 'মানসী'-র নিসর্গ সম্বন্ধীয় কবিতাগুলি তাঁর তীব্র সচেতন, অনুভূতি এবং অপূর্ব ছন্দ সম্পদে সমৃদ্ধ। 'সিন্ধুতরঙ্গ', 'মেঘদূত' প্রভৃতি কবিতায় যে চিত্তের অধীরতা, মনের উন্মুখ প্রসার এবং যে সরল কল্পনার ঐশ্বর্য দেখতে পাওয়া যায়

তা পরবর্তী কোনও কবিতাতেই দেখা যায় না। এবং পরবর্তীকালে 'সোনারতরী' 'চিত্রা' 'চৈতালী' 'কল্পনা' প্রভৃতি কবিতাতেই বিচিত্র অভিজ্ঞতার দ্বারা সমৃদ্ধ হয়ে বিচিত্ররূপে প্রকাশ পেয়েছে। আমাদের জীবনের রবীন্দ্রনাথের ভাবপ্রসঙ্গও ক্রিয়াগুলি ধরা পড়েছে।

★ গীতাঞ্জলি পর্বে রবীন্দ্র মানসিকতা :-

'খেয়া' তে কবির এক নতুন জন্মান্তরের সূচনা আমরা দেখেছি। কিন্তু, শুধু ভাবের জগতেই কবি জন্মান্তর ঘটেছে এমন নয়, রূপের জগতেও কবির জন্মান্তর ঘটেছে। 'খেয়া'র পর কবি এই সুরের জগতের স্রষ্টা হল। সুদীর্ঘ বছরের পর বছর কবির সুরের রাজ্যে নিজেকে ডুবিয়ে রাখলেন যে কবিকে আমরা গম্ভীর শুনেছি জ্ঞানলাভের কথা, যাকে দেখেছি উর্বশীর সৌন্দর্য্য নয়ন ও মন ভরে উপভোগ করতে, পৃথিবীর সুবিস্তৃত বুকে নিজেকে বিস্তারিত করতে, বিশ্বনারীর চম্পু বিশ্ব মহিমা প্রাণ ভরে দেখতে, কালবৈশাখীর ঝড়ের উন্মত্ততায় নাচতে, সেই বিচিত্র সৌন্দর্য্য মিলিত কবিমনের আজ কী হল? বিরাট এক অন্তহীন গভীর, প্রেম ও আবেগ কবি মনকে আকর্ষণ করল। যার ফলে, সমস্ত দেহ, মন, কল্পনা বন্দির মতো কেঁপে শিউরে উঠতে লাগল। কবির সমস্ত বল যেন অদৃশ্য হয়ে গেল। কোথায় গেল বুদ্ধির যত ঔজ্জ্বল্য, ভাষার যত শক্তি ও উচ্ছ্বাস, কল্পনার সবল উদ্দীপনা! সমস্ত অলংকার যেন একমুহূর্তে খসে পড়ল। সমস্ত বাহুল্য অদৃশ্য হয়ে গেল। কবি যেন তাঁর হৃদয়কে একেবারে ঢেকে না রেখে দেবতার সামনে অঞ্জলি দেবার মতো তুলে ধরলেন।

যে কয়েকটি কথা সুরের রূপ দিয়ে মন বিলীন করে বেরিয়ে এলো তা একান্তই সহজ ও সরল।

☐ 'সোনার তরী' - 'চিত্রা' 'কল্পনার' - মানসীর কবি, মানব ও প্রকৃতির কবি, প্রেম ও সৌন্দর্যের কবি, বিচিত্র রসানুভূতির কবি যে 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' - 'গীতালি' তে এক ভিন্ন স্বাদের সুর অধ্যাত্মজীবনের দুইগ্রন্থ লাভ করেছেন। তা কিছু আকস্মিক ব্যাপার নয়। সৌন্দর্য - মাধুর্য - প্রেম-আনন্দ সকল রসের মধ্যে যিনি এতদিন ডুবে ছিলেন তিনি যে প্রেম সৌন্দর্য মাধুর্যকে পাবার জন্য ব্যাকুল হবেন, সকল রসের মূলে পৌঁছতে চাইবেন, এটা তো খুবই স্বাভাবিক। এই প্রচেষ্টা 'খেয়া' থেকে শুরু হয়েছিল, কিন্তু 'গীতাঞ্জলি'তে স্পষ্ট রূপ ধারণ করল, পরিণত সার্থকতা পেল 'গীতিমাল্যে'। কিন্তু নিসর্গ - প্রকৃতির গান এবং আরও কয়েকটি গান ও কবিতা ছেড়ে দিলে, 'গীতাঞ্জলি'র প্রত্যেকটি গানে তাঁর স্বরূপ স্বরূপ পাবার জন্য কবিমনের কী আকুলতা, সর্বত্র তাঁর উপস্থিতি অনুভব করার জন্য কি তীব্র আবেগ, নিজের সকল অলংকার ভেঙে জীবন কুসুমটি দেবতার পায়ে উৎসর্গ করার প্রাণপাত নিবেদন করেছেন। 'গীতাঞ্জলি' তে এই অতীন্দ্রিয়লোকের কবিমনের সহজ, সরল, উৎকণ্ঠিত সুরে লীলার কোন আভাস আমরা পাই না। পাই সাধনার বেদনা ও তার বিভিন্ন সুর, পাই সংগ্রামের আভাস, পাই ব্যর্থতার ও বিরহের আর্ত ক্রন্দন। আর যতদিন পর্যন্ত জীবনের এই সাধনার আনন্দ সহজ হয়ে উঠল না, উৎকণ্ঠিত সহজ হল না, ততদিন সৌন্দর্য অনুভূতি কবি কিছুতেই তৃপ্ত হতে পারলেন না।

সেই তৃপ্তি ও শক্তি। আরাম ও আনন্দ লাভ হল। 'গীতিমাল্যে', অতৃপ্ত জীবনের সার্থক প্রকাশের দিক থেকে 'গীতিমাল্য' এবং 'গীতালি' 'গীতাঞ্জলির' শ্রেষ্ঠ একথা বলতে আমার কোন দ্বিধা নেই।

☐ গীতাঞ্জলি – গীতিমাল্য – গীতালি এই গ্রন্থ তিনটির প্রায় সবকটিতেই গান, 'খেয়া' গ্রন্থে আমরা দেখেছি যে কবির উন্মুখ কবিমনের গভীর প্রতীক্ষা। 'গীতাঞ্জলি'তে দেখেছি উন্মুখ গভীর প্রতীক্ষা বিরহের স্পন্দনে যেন গুমরে - গুমরে উঠেছে। বিরহের বেদনা, দেবতাকে সার্থ ভাবে পাওয়ার দুঃখ গীতাঞ্জলির গানগুলির উপর গভীর ছায়া ফেলেছে। নানা অবস্থা, পরিবর্তনের মধ্যে কবি দেবতার সান্নিধ্য লাভ করতে চেয়েছেন। নানাভাবে কবি তাকে পেতে চেয়েছেন। কোথাও যেন পাওয়া সম্পূর্ণ হল না। সেইজন্যই একটা ব্যথা - বেদনার সুর 'গীতাঞ্জলির' তাকে গানেই লক্ষ করা যায়। দুঃখ - আঘাত - বিচ্ছেদের মধ্য দিয়ে কবি যে সাধনা যে সাধনাকে কবি স্বীকার করেছেন। এবং সেই সাধনার মধ্য দিয়ে তা উত্তীর্ণ করে তিনি দেবতার স্পর্শ পেতে চেয়েছেন। দুঃখ, আঘাত, বেদনা, যে দেবতারই স্পর্শ এই উপলব্ধি কবিমনে জেগে উঠেছে। আবার নিজের অহংকারকে ভেঙে ফেলার যে সাধনা সেই সাধনাকেও কবি স্বীকার করেছেন। এবং নিজের সব অহংকারকে ও চোখের জলে ডুবিয়ে দেবার সাধনা অভ্যাস করেছেন। আবার, কর্মযোগের যে সাধনা তা ও কবি স্বীকার না করে পারেননি, এ কথা তার উপলব্ধির মধ্য দিয়ে ধরা পড়েছে। আমাদের দেশে যিনি উঁচু সুউচ্চ সিংহাসন ছেড়ে নেমে এসেছেন,

সবার পিছনে, সবার নীচে, সর্বহারাদের মাঝে। কবি সেই চরণতলে স্পর্শ করতে চেয়েছেন। 'গীতাঞ্জলি'র গানগুলিতে তাই দেখি নিঃস্ব, রিক্ত কবি এই সসীমের ~~[illegible]~~ ইঙ্গিত পাচ্ছেন যায়। অসীমের অনির্দিষ্ট সর্ব যে এক কথা তা 'গীতাঞ্জলি'তে নেই অনেক চলে। 'নৈবেদ্য'-র 'গীতাঞ্জলি'র অধিকাংশ গান ও কবিতা কামমুক্ত হতে পারেনি। বিশেষভাবে এই কথা সত্য, গীতাঞ্জলির অধিকাংশ গানে বলেছে কথা অপেক্ষা। সসীমের কথা বড়ো। আনন্দ অপেক্ষা বেদনার কথা অধিক।

'বলাকা' পর্বে রবীন্দ্র মানসিকতা :-

'গীতাঞ্জলি' পর্ব শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এক নতুন কাব্য সৃষ্টির সূত্রপাত হল। সেটি হল – 'বলাকা'। ১৩২১ বঙ্গাব্দে আষাঢ় মাসের মধ্যে 'গীতিমাল্য' শেষ হল। 'গীতালি'র গানগুলি ও গান ও কবিতা আষাঢ় থেকে কার্তিক মাসের মধ্যে রচিত। 'গীতাঞ্জলি' – 'গীতিমাল্য' 'গীতালি'র কবি, হঠাৎ 'বলাকায়' নতুন ছন্দলোক রচলেন, তা বাস্তবে এক বিস্ময়কর ব্যাপার।

◫ মানুষ সাধারণভাবে সুখ, দুঃখ, আশা, নিরাশার মধ্যে দিয়ে জীবন অতিবাহিত করে। যখন কোনো কিছুর মধ্যে দিয়ে তাদের শান্তি লাভ করতে পারে না। তখন সে ভগবানকে একান্তে আশ্রয় জেনে তাতেই আত্ম সমর্পণ করে। এবং তার সঙ্গে মিলনের আনন্দ ছাড়া আর কোনো কিছুই অপেক্ষা বা আকাঙ্ক্ষা রাখে না। এটি সাধারণ মানুষের কথা, তবে কবি জীবনেও তাই ঘটে থাকে। আমরা হয়তো ভেবেছিলাম 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য' 'গীতালি'র তিনটি কাব্যেতে আত্মনিমজ্জন করে ঈশ্বরের চরণে কবি

নিজেকে নিবেদন করে, কবিমনের শেষ আশ্রয় হল। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের তা হল না। কারণ তিনি তা চেয়েছিলেন, তাঁর চির পথিক কবিমন কোন নির্দিষ্ট ভাবক্ষেত্রে আটকে রাখতে পারেননি। নতুন-নতুন ভাবের জন্য উপলব্ধি করার জন্য আকুল প্রেরণা যে কবিকে পাগল করে তোলে। অতীন্দ্রিয় উপলব্ধির একটা অতল-স্নিগ্ধ আনন্দ নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু সেই স্থির শান্ত গতিহীন আনন্দ ক্ষেত্র তাঁকে শেষপর্যন্ত বেঁধে রাখতে পারেনি। 'গীতিমাল্যে'র শেষের দিকে এবং 'গীতালি'তে অতীন্দ্রিয় কাব্যানুভূতি কে ছেড়ে মাঝে মাঝে প্রবাসে গেছে। মানবপ্রীতি ও নিসর্গ সৌন্দর্য প্রেরণা; 'গীতালি'র শেষের দিকে আমরা দেখেছি অসীমের পথের আহ্বান কবিকে ব্যাকুল করে তোলে। এই

□ অবশেষে হঠাৎ কবির 'বলাকায়' নবজন্ম লাভ ঘটলো এবং পুরোনো পৃথিবীর প্রতি মমত্ববোধের সঙ্গে সঙ্গে নিজের জীবনকে নতুন ভাবে ধীরে ধীরে 'পুনর্জন্ম' লাভ করবার চেষ্টাও দেখা দিয়েছে। 'বলাকা' গতিবাদের কাব্য। এই গতিবাদ কবিকে মুগ্ধ করে। কবিমনের এক নতুন ভিন্ন স্বাদের অনুভূতি মেলে উঠল। এই 'বলাকায়' এই গতিতত্ত্ব কখনো আপাত দৃষ্টিতে স্থির বস্তুকে কেন্দ্র করে (ছবি, 'তাজমহল'), আবার কখনো চঞ্চল বস্তুকে কেন্দ্র করে ('চঞ্চলা', 'বলাকা')। এই গতিতত্ত্ব নিয়ে মিশে এসেছে বাংলাদেশের স্বদেশী আন্দোলনের পটভূমিতে যৌবনের জয়গান। আবার, এই কবিতায় রয়েছে সৃষ্টির রহস্য। যে কবিতাগুলি রবীন্দ্রযুক্ত সৌন্দর্য, সহজ-সরল অনুভূতির সম্পর্ক ও অন্তর রহস্যের সুনিবিড়তা 'গীতিমাল্য' 'গীতালি'র অতীন্দ্রিয়ভাবনার শান্তি ও তৃপ্তির সুরের সমান।

'বলাকা'র রবীন্দ্রনাথ 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্যে'র রবীন্দ্রনাথের থেকে আলাদা শুধু ভাবের ক্ষেত্রে পৃথক নয়, কলাকৌশলেও পৃথক। 'বলাকা'র ছন্দ যেন যৌবনের ছন্দ, উদ্দাম বেগে কলনৃত্যে ছুটে চলেছে। যেন নিজের কী তোমাদের মতো বিরামহীন নদী। আর যৌবন যেন ফিরে এসেছে যা কবি নিজেই স্বীকার করেছেন। মানুষের শরীরের অস্থিমজ্জাগুলির ভিতর ও বাইরের অনেক অমর ভূমি। অনেক দুঃখ-গভীর রহস্য প্রতিফলিত কবিচিত্তের সম্মুখে উদ্ভাসিত হয়েছিল। 'বলাকা'য় প্রায় সকল কবিতাতেই প্রেম - যৌবন - সৌন্দর্য ও জীবন গতিবেগের প্রকাশের কথাই কে তুলে ধরেছেন। 'বলাকা'র বিভিন্ন কবিতায়।

—o—

বলাকার জন্মকথা :-

'বলাকা' কাব্যটি গতিবাদের কাব্য। রবীন্দ্রনাথ চিরদিন-ই গতির উপাসক ছিলেন। এ কথা আমরা অনেক আগেই জেনেছি, ১৯১২ সালে তাঁর 'ডাকঘর' ও 'অচলায়তন' বের হল। তারপর তিনি নানাদেশে ভ্রমণ করলেন ও নানাদেশের মনীষীদের সঙ্গে পরিচিত হলেন। গীতাঞ্জলির প্রচার হল ১৯১৩ সালে তিনি নোবেল পুরস্কার পেলেন। তারপর প্রমথচৌধুরী মহাশয়ের 'সবুজপত্র' বের হল। তাতে রবীন্দ্রনাথ নবযৌবন ও গতিতত্ত্ব ঘোষণা করলেন। এই সময়েই 'বলাকা'র কবিতা গুলি একে একে জন্ম করতে আরম্ভ করল। অবশেষে ১৯১৬ সালে 'বলাকা' ছাপা হয়।

☐ সেইসময় কবি 'সবুজপত্রে' কয়েকটি কবিতা লিখতে ও শুরু করলেন। প্রথম কবিতাটি শান্তিনিকেতনে লেখা (১৫ই বৈশাখ ১৩২১), সেখান থেকে কয়েকদিন পর পুত্রবধূ ও কন্যাকে নিয়ে কবি রামগড় পাহাড়ে গেলেন। আনন্দ উৎসবের মধ্যে কবিমনের একটা বেদনা। রামগড়ে (৫ই জ্যৈষ্ঠ ১৩২১) 'বলাকা'র দ্বিতীয় কবিতাটি লেখা। এরপর যুরোপের মহাযুদ্ধের খবর এল। আসলে তখনই বোঝা গেল কবির মনে তার-ই পূর্বাভাস বেদনা রূপে জেগেছিল। ৩ই জ্যৈষ্ঠ বোঝা গেল কবির মনে তারই পূর্বাভাস বেদনা রূপে জেগেছিল। এই তৃতীয় কবিতাটি লিখেছেন। ১২-ই জ্যৈষ্ঠ লিখেছেন চতুর্থ কবিতাটি। তাঁর কবিতাগুলি পাঠে সমগ্র রবীন্দ্রনাথের মনে অশান্তি ও বেদনার ভাব। যুদ্ধের কারণে কবির মনে ঐ বেদনা। বোঝা যায়।

আরও কয়েকদিন পর, জ্যৈষ্ঠ মাস শেষ হবার আগেই, রবীন্দ্রনাথ পাহাড় থেকে ফিরে এলেন। ইতিমধ্যে গ্রীষ্মাবকাশে বিদ্যালয় খুলে যাওয়ায়, কলকাতা থেকে রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। 'বলাকা' কবিতা কিছুদিন বন্ধ থাকল।

১৩২১ সালে ৫ই ভাদ্র বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের পঞ্চাশতম জন্মদিনে রবীন্দ্রনাথ কলকাতা যান। ঐ ৫ই ভাদ্র কলকাতায় ৫নং কবিতাটি লেখা হল। তারপর কার্তিক মাস পর্যন্ত 'বলাকার' আর কোন কবিতা লেখা হয়নি।

এরপর কবি এলাহাবাদে ২১শে আশ্বিন 'গীতালির' দুটি গান রচনা করলেন। 'গীতালি' সবটাই এলাহাবাদে লেখা। ৩রা কার্তিক 'গীতালির' শেষ কবিতাটি লিখে কবি 'বলাকার' ৬নং কবিতাটি লিখলেন। ঐ কবিতাটি হল 'ছবি'। এখানেই ১৫ই কার্তিক কবি 'বলাকার' ৭নং কবিতা 'সাজাহান' কবিতাটি লেখেন।

অগ্রহায়ণে কবি আগ্রা গেলেন। আগ্রা থেকে এলাহাবাদে ফিরে 'বলাকার' কয়েকটি কবিতা লেখেন। ৮নং কবিতাটি ('চঞ্চলা') এলাহাবাদে ৩রা পৌষ লেখা। ৯নং কবিতা ও ৫-ই পৌষ এলাহাবাদে লেখা। ১০ই পৌষ শান্তিনিকেতনে তিনি 'বলাকার' ১০নং কবিতা লিখলেন। ১২ই পৌষ ১১নং এবং ১৩ই পৌষ ১২নং কবিতা তিনি শান্তিনিকেতনে লিখলেন। ১৩নং কবিতাটি ২৩শে পৌষ সুরুলে বসে লেখা। ছাব্বিশে পৌষ শান্তিনিকেতনে ১৪নং কবিতাটি লিখলেন। ১৫নং ও ১৬নং কবিতা দুটি আটাশে পৌষ শ্রীনিকেতনে লেখা হল। ১৮নং ও ১৯নং শান্তিনিকেতনেই উনত্রিশে পৌষ প্রভাতকালে রচনা হল।

ঐ কবিতাটি লেখার পর কবি সাহেবদের জন্য কলকাতা পথে চলে বসে ২০ নং কবিতাটি লিখেছেন। কলকাতা পৌঁছে ও সাহেবদের ব্যস্ততায় সেই আনন্দ প্রকাশ করার সময় পেলেন না। ৮ ই মার্চ তিনি ২১ নং কবিতায় তাঁর সেই আনন্দটিকে রূপ দিলেন।

আবারো-ই মার্চ শিলাইদহে নির্জন পদ্মাতীরে গিয়ে কবি যেন নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। উনিশে মার্চ ২২নং এবং বিশে মার্চ ২৩ নং, ২৪নং, ২৫নং ও ২৬ নং কবিতাটি লিখলেন, বাইশে মার্চ ২৭ নং, চব্বিশে মার্চ ২৮নং, পঁচিশে মার্চ ২৯নং, ছাব্বিশে মার্চ ৩০ নং, সাতাশে মার্চ ৩১নং কবিতা, ৩২নং ও ৩৩নং কবিতা রচনা করলেন। এতেই বোঝা যায় কবির মনের মধ্যে কাব্যলক্ষ্মীকে আহ্বান ঠিক আগের অবস্থাটি পেয়েছিলেন। নয়দিনের মধ্যে এতগুলি কবিতা লেখাতে সংস্থান।

১০ ই ফাল্গুন কলকাতা থেকে শান্তিনিকেতন হয়ে কবি সকালে সুরুল (শ্রীনিকেতনে) চলে গেলেন। সেখানে কবি ফাল্গুনী নাটক লেখা শেষ করে, ২০ শে ফাল্গুন তা আশ্রমের সকলের কাছে পাঠ করে শোনান।

তারপরেই ২০ শে মার্চ লর্ড কারমাইকেল আশ্রমে যান। কবির সঙ্গে তার দেখা হয়। ১৪ ই চৈত্র কবি কলকাতা যান। এই সব ব্যস্ততায় কবির 'বলাকার' কবিতা লেখা হল না। কলকাতা থেকে এসে ২১ শে চৈত্র সুরুলে (শ্রীনিকেতনে) তিনি ৩৪ নং কবিতাটি লেখেন। ইতিমধ্যে 'ফাল্গুনী'র গান, সুর, নিয়ে কবি খুবই ব্যস্ত। 'সঙ্গে সঙ্গে এল বর্ষশেষ ও নববর্ষের উৎসব। এরপর কবি কলকাতায় যান। নানাকারণে কবির মনে নানা দুশ্চিন্তা দি

২৪ শে শ্রাবণ কবি আশ্রমে ফিরলেন। কয়েক দিন পর শারদোৎসবের জন্য কবি ছেলেদের নিয়ে খুবই ব্যস্ত। এইসব ব্যস্ততার মাঝে 'বলাকার' কবিতা আর লেখা হলো না। ইতিমধ্যে কাশ্মীর যাবার সিদ্ধান্ত হল।

☐ পুত্র, পুত্রবধূ ও অন্য আত্মীয় দলকে নিয়ে কবি কাশ্মীর গেলেন। এবং বহুদিন পর ১৩২২ সালে ৭ই কার্তিক 'বলাকার' ৩৫নং কবিতা শ্রীনগরে লেখা হল। ২১ শে উত্তর পর ঐ কবিতার জন্ম। সাহিত্যের হিসেব হল 'বলাকা (৩৬)', যা কয়েকদিন পরে শ্রীনগরে লেখা। শ্রীনগরে ঝিলাম নদীর বুকে হাউসবোটের উপর দিয়ে একঝাঁক বলাকা উড়ে গেল। তারপরে ওই কাব্যের কবিতার উদয় হল। এই কবিতার নামেই বইয়ের নাম হল - 'বলাকা'। এবং কবিতাটি ও ২৩ শে কার্তিক এখানেই লেখা।

☐ কাশ্মীর থেকে এসে কবি শিলাইদহ গেলেন। সেখানে পদ্মা বক্ষে ১২-ই অগ্রহায়ণ কবি 'বলাকার' ৩৮নং ও ১৩ ই অগ্রহায়ণ ৩৯নং কবিতা টি লেখেন। এরপর কবি শিলাইদহ থেকে কলকাতায় আসেন কিন্তু পৌষ উৎসবের জন্য শান্তিনিকেতনে ফিরলেন। ~~৭ই ফাল্গুন~~ শিলাইদহে বসে কবি ৪০নং ও ৮ ই ফাল্গুন ৪১ - ৪২ নম্বর কবিতাটি লেখেন। এরপর কবি শান্তিনিকেতনে ফিরে ২৯ শে ফাল্গুন 'বলাকার' ৪৩ নম্বর ও ৪ঠা চৈত্র ৪৪ নং কবিতা লিখলেন।

☐ শান্তিনিকেতনে বর্ষশেষও নববর্ষ উৎসব এল। কবির ১ম ও ২য় বলাকার মতো তোমায় মন চাইবার জন্য চঞ্চল। ৭ই বৈশাখ তিনি কলকাতায় ফিরে 'বলাকার' শেষ কবিতাটি ৪৫নং (নববর্ষের আশীর্বাদ) কবিতাটি লিখলেন।

প্রথম সংখ্যাতেই রবীন্দ্রনাথের বিখ্যাত কবিতা 'সবুজের অভিযান' বের হল। তিনি 'কাঁচা, সবুজ, অবুঝ, দুরন্ত, জীবন্ত, অশান্ত, প্রমত্ত, চিরযৌবন' বলে নবীনকে চিরপ্রচলিত জড় কুসংস্কারের খাঁচা ভেঙে ফেলার জন্য আহ্বান করেছেন। রবীন্দ্রসাহিত্যে এক প্রবল শক্তিশালী নতুন সুর ধ্বনিত হল। যা সমগ্র বাংলাসাহিত্যের ইতিহাসে এ এক প্রবল শক্তিশালী নতুন সুর বলে পাঠক মহলে সাড়া পড়ে গেল।

☐ এই নতুন সুর হল – 'বলাকার সুর'। প্রকৃতির মধ্যে সতত অনন্ত গতিবেগ বর্তমান, এই চলমান গতিপ্রবাহের মধ্যে মানবজীবনের চরম সত্য নিহিত। এদের যিনি অধীশ্বর তিনি ও লীলায় মত্ত হয়ে ছুটে চলেছেন। পরিবর্তন ও এগিয়ে যাওয়া হল – সৃষ্টির সত্যরূপ। এই পরিবর্তনে বাধা দিলে সৃষ্টি ও পঙ্গুতায় মৃত্যু আসবে। পরিবর্তন ও নতুনত্বকে বরণ করাই হল – জীবনের অস্তিত্বের পরিচয়। 'বলাকায়' কবির এই নতুন ভাব ও অনুভূতি প্রকাশ পেয়েছে। 'বলাকায়' কবিতাগুলির মধ্যে মোটামুটি এই কয়েকটি ভাবধারা লক্ষ করা যায়ঃ—

(ক) নিখিল বিশ্বের মধ্যে অবিরাম গতিবেগের অনুভূতি লক্ষ করা যায় – 'ছবি', 'শাজাহান', 'চঞ্চলা', 'বলাকা', 'বলাকা' প্রভৃতি কবিতাগুলির মধ্যে।

(খ) মানবজীবনের গতির অনুভূতি, গতির প্রতীক, এবং গতিময়তাজীবন ও যৌবনের জয়গান লেখেছেন। 'সবুজের অভিযান' (১নং), 'শঙ্খ', 'ঝড়ের খেয়া', 'নববর্ষের আশীর্বাদ' প্রভৃতি কবিতায়।

(গ) জীবনের লীলা রহস্যের অনুভূতি কথা বলতে পারি। 'প্রেমের বিকাশ', 'তুমি-আমি' (২৩), 'মানসী' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে।

(ক) কবি অনুভব করেছেন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে নিরন্তর পরিবর্তনের স্রোত বয়ে চলেছে। বিশ্বের কোনোকিছুই স্থির নয়, প্রতি মুহূর্তে তার রূপান্তর ঘটছে। অতীত যুগের একটা গতি আছে, প্রতিই পল-অনুপল, অনন্তকাল অস্থির প্রবাহে ছুটে চলেছে। বিশ্বের সৃষ্টি ধারাতে সৃষ্টি করে। জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি-ধ্বংস, ক্ষয়-ক্ষয়ান্তরের, রূপ-রূপান্তরের মধ্য দিয়ে এই গতিস্রোত অবিরাম ভাবে ছুটে চলেছে। এটি সৃষ্টির অন্তর্নিহিত সত্যভাবের রূপ। এই তত্ত্ব কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি ও আবেগের মধ্যদিয়ে অপূর্ব কাব্যরূপ বিবৃত করেছে। ঃ 'ছবি' 'শাহজাহান' 'চঞ্চলা' 'বলাকা' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে।

(খ) কোনো এক আত্মীয়বাড়িতে গিয়ে মৃত পত্নীর ছবি দেখে কবির মনে যে ভাবনা চিন্তা ও আবেগের সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিলেন তাই ব্যক্ত করেছেন "ছবি" কবিতায়। কবি পত্নী আজ অচল ছবিতে আটকা আছে। কিন্তু জীবিতকালে তিনিই ছিলেন একান্ত প্রিয় জীবনসঙ্গিনী। একসাথে পথে হেঁটেছেন, তিনি ছন্দের সঙ্গে তাল রেখে তাঁর প্রীতি ভরা পথে নুপুর নুপুর ছন্দ নিনাদিত হয়েছে। কবির জীবনে তিনি-ই বড় সত্য ছিলেন। তার মৃত্যুর মধ্য দিয়ে কবি কিছুতে সুদূর চেয়েছিলেন, বিশ্বের আনন্দ বার্তাকে তিনি বারবারে কবির কাছে বহন করে এনেছিলেন।

(গ) দুজনে একসাথে জীবনযাত্রা শুরু করেছিলেন। কিন্তু, মধ্যপথে কবির পত্নীর যাত্রা থেমে গেল। কবি একাই জীবনপথে অগ্রসর হতে লাগলেন। প্রতিমুহূর্তে নানা পরিবর্তন ও ধ্বংস ও সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অজানার পানে চলেছেন। কিন্তু পত্নী চিরদিনের মতো থেমে নিশ্চল হয়ে একেবারে 'ছবি' হয়ে রয়ে গেলেন। ঃ—

অজস্র সুখে
চলেছি দূর হতে দূরে
মেতেছি পথের প্রেমে।
তুমি পথ হতে নেমে
যেখানে দাঁড়ালে
সেখানেই আছ থেমে।
এই তৃণ, এই ধূলি, — ওই তারা, ওই শশী রবি
সবার আড়ালে
তুমি ছবি, তুমি শুধু ছবি।

ওই পর্যন্ত এসে কবির চিন্তাধারা অন্যদিকে মোড় নিল। প্রথমে কবি বলেছিলেন - চলমান সৃষ্টির মধ্যে 'ছবি' - ই অচল, গতিশীলতার মধ্যে তাই চিরস্থির, কিন্তু এখন কবি বলছেন - তাঁর এ ধারণা ভুল, তাঁর প্রিয়া তোমার অস্তিত্ব তো চিরকালের মতো আবদ্ধ হয়ে নেই। তার মধ্যে যে সৃষ্টির আনন্দ শক্তি ফুটে উঠেছিল, সেই আনন্দ তো চিরন্তন, সে নতুন নতুন ভঙ্গিতে চিরকাল ধরে বিশ্বের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করেছে। কবি তাঁকে চোখে দেখতে না পেয়ে ভুলে গিয়েছিলেন, সে ভুল তো বাইরের প্রত্যক্ষ চেতনার ক্ষেত্র থেকে অপসারিত হলেও তিনি হৃদয়ের গভীর অন্তঃস্থলে থেকে কবির মানসলোকে, সৌন্দর্য চেতনার ও কবিত্ব শক্তির প্রেরণা যোগিয়েছে। সুতরাং কবির প্রিয়া আজ ছবি নন শুধু, তিনি একটা বেগবতী শক্তি।

কী প্রলাপ কহে কবি?
তুমি ছবি?
নহে, নহে, নও শুধু ছবি।

কে বলে রয়েছো স্থির রেখার বন্ধনে
নিস্তব্ধ ক্রন্দনে?

তোমায় কি গিয়েছিনু ভুলে?
তুমি যে নিয়েছো বাসা জীবনের মূলে
তাই ভুলি।

ভুলে থাকা নয় তো সে ভোলা;
বিস্মৃতির মর্মে বসি রক্তে মোর দিয়েছো যে দোলা।
নয়ন সম্মুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছো যে ঠাঁই;
আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল
তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে
তব সুর বাজে মোর গানে;
কবির অন্তরে তুমি কবি,
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি।

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের সাত সংখ্যক কবিতা হল - 'শা-জাহান',

কবিতাটি প্রথম ১৩২১ সালে সবুজপত্র পত্রিকায় অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এই কবিতায় কবি বলাকার সুন্দর গতিকে অবলম্বন করে কবি শা-জাহানের প্রেম ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। আমরা জানি মমতাজের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শাজাহানের নির্মিত তাজমহল বিশ্বের অন্যতম আশ্চর্য। মমতাজের প্রতি তার প্রেমকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য শাজাহানের অন্যতম প্রয়াস। যার সৌন্দর্য আজও বিশ্ববাসীর মনকে মুগ্ধ করে।

☐ কবিতার প্রথমে কবি কালের প্রবহমানতা কে স্বীকার করেছেন। কবি সেইসঙ্গে মহাকালের অসীম ক্ষমতার কথা ও স্বীকার করেছেন। কবি বলেছেন। এই মহাবিশ্বে কোনো কিছু-ই চিরস্থায়ী নয়। সমস্ত কিছু-ই মহাকালের কাছে পরাজয় স্বীকার করে। মহাকালের গর্ভে একদিন তলিয়ে যাবে। তাই কবি বলেছেন :—

"এ কথা জানিতে তুমি, ভারত ঈশ্বর শা-জাহান
কালস্রোতে ভেসে যায় জীবন যৌবন ধনমান।"

☐ 'শাজাহান' কবিতায় এমনই এক সত্যকে তুলে ধরেছেন। যা চিরন্তন। চলার পথে সমস্ত কিছু-ই পেছনে ফেলে যেতে হয়। এমন কী প্রেমকে ও। কিন্তু প্রেমিক হৃদয় তার প্রেমকে চিরকালীন রূপ দেওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যায়। সম্রাট শাজাহান ও তাই কালস্রোত কে তুচ্ছ জ্ঞান করে তার অন্তরলোকে চিরকালীন রূপ তাজমহল নির্মাণ করেছিলেন

তাঁর হৃদয় নিংড়ানো অশ্রুস্রোতের একবিন্দু অশ্রু যেন অপূর্ব সৌন্দর্য মণ্ডিত হয়ে তাজমহলের মধ্যে শোভা পায়। এটা ছিল তার ইচ্ছা। কিন্তু শুধু অশ্রুর তাজমহল একদিন ক্ষীণ হবে। উদ্ভ্রান্ত প্রেমিক হৃদয় তা অনুধাবন করতে পারেনি। এখানেই সম্রাটের ভ্রান্তি। কিন্তু শাজাহানের প্রেমিক হৃদয়ের মধ্যে কোনো খাদ ছিল না।

☐ মানুষ মাত্রেই চিরন্তন পথ চলার পথিক। তাকে অবিরত ধীরে কোথাও স্থির থাকার উপায় নেই। জন্ম - জন্মান্তরের মধ্য দিয়ে কেবল সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছে। এক জীবনের ধন, মান, যশ, সবই সেই জীবনে পড়ে থাকে। জীবনের শেষপ্রান্তে তাকে শূন্য হাতে আবার পরবর্তী জীবনের প্রবেশ করতে হয়। জীবনের সমস্ত কিছু পিছু পড়ে থাকে। মানুষ কেবল সম্মুখ পথ ধরে এগিয়ে চলে পিছন ফিরে তাকাবার অবসর মানুষ পায় না। তাই কবি বলেছেন :—

"হায় ওরে মানবহৃদয়
বারবার
কারো পানে ফিরে চাহিবার
নাই যে সময়
নাই নাই।"

অর্থাৎ, জন্মান্তরই জীবনের আসল ধর্ম। 'বলাকা' কাব্যের অন্যান্য কবিতায় সে কথাই ধ্বনিত হয়েছে।

☐ তাজমহল যেন সম্রাট শাজাহানের নূতন মেঘদূত। প্রেম-বিরহের অপূর্ব স্মৃতি, কালিদাসের মেঘদূতের দূত ছিল মেঘ, শাজাহানের

নব মেঘদূতের দূত হল - তাজমহলের সৌন্দর্য। যেমন মেঘ যক্ষের বেদনা বার্তাকে যক্ষপ্রিয়ার কাছে পৌঁছে দিয়েছিল তেমন-ই তাজমহলের অনুপম সৌন্দর্য ও দূতের মতোই শা-জাহানের বাণী কে নীরবে বহন করে চলেছে।

'তুমি নাই, তুমি নাই, তুমি নাহি প্রিয়া',

কালের প্রবহমানতায় সমস্ত কিছু, কিছু পড়ে থাকে। যশ ও খ্যাতি অতিক্রম করে মানুষ এগিয়ে চলে। প্রেম - ভালোবাসা - স্নেহ - মায়া - মমতা - সমস্ত কিছু-ই পেছনে পড়ে থাকে। এ কবিতায় কবি নিজেও এ কথা স্বীকার করে শাহজাহানের অমর প্রেম ভাবনার পরিচয় দিয়েছেন। 'বলাকা' কাব্যের মূল ভাবনার সঙ্গে এখানেই মিল। আলোচ্য কবিতায় কেন্দ্রীয় ভাবনার কয়েকটি পংক্তিতে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। যা শিল্প সৌন্দর্যের দিক থেকে বিশেষ উৎকর্ষ লাভ করেছে। যথা—

"তোমার কীর্তির চেয়ে, তুমি যে মহৎ
তাই তব জীবনের রথ
পশ্চাতে ফেলিয়া যায়, কীর্তিরে তোমার
বারম্বার।"

গতি-ই জীবন। থেমে থাকা মৃত্যুর নামান্তর। এই গতিবাদের কথাই বলাকা কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় ফুটে উঠেছে। 'বলাকা' কাব্যগ্রন্থে আলোচ্য এই কবিতাটি সবুজপত্র পত্রিকায় 'চঞ্চলা' নামে প্রকাশিত হয়। আলোচ্য কবিতায় কবি এই জীবন তথা বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের নদীর সঙ্গে তুলনা করেছেন। জগৎ ও জীবনের গতিময়তাকে বিশ্লেষণ করেছেন।

☐ কবিতার প্রথমেই কবি বলেছেন, বিরাট নদী অবিরল অবিরাম ধারায় বয়ে চলেছে। এই নদীর স্রোত আমাদের দৃষ্টিতে ধরা পড়ে না। কিন্তু তার সেই দুরন্ত বেগ বোঝা যায় নদীর উপর ভাসমান ফেনাপুঞ্জ দেখে। জলের বেগে যেমন ফেনার উৎপত্তি তেমনি কালের প্রবাহে বস্তু ও বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি। নদীও আসলে বিশ্বের স্বরূপ। কবি নদীর সঙ্গে বিশ্বপ্রবাহকে তুলনা করেছেন গতিময়তাকে বোঝানোর জন্য।

☐ এরপর কবি নদীকে নর্তকীরূপে কল্পনা করেছেন। কখনো ভৈরবী, কখনো বৈরাগিনী শব্দহীন সুরে নিরুদ্দেশ এর পানে তার পথচলা। কবি বিশ্ব গতিপ্রবাহকে কল্পনা করেছেন প্রিয়তমের দিকে এগিয়ে চলার অভিসারিকা নারীর ছবি রূপে। প্রিয়তমের আবেগ ব্যাকুল ডাকে এই নদী অন্তহীন দূরে ধাবমান। কবি বলেছেন,

"উন্মত্ত সে অভিসারে
তব বক্ষ হারে
ঘন ঘন লাগে দোলা — ছড়ায় অমনি
নক্ষত্রের মণি"।

▢ অতঃপর কবি বলেছেন নদীর মতোই হও। বিরামহীন গতিতে এগিয়ে চলো। এগিয়ে চলাই নদী, অনুকালে কাদতেই আর পিছনে ফিরে আসতে পারবে না। পথ চলার বিপুল আনন্দে প্রথম-কাল বাহিতে বইতে এগিয়ে চলে। অতিপ্রবাহের জন্যই নদী সর্বদা নির্মল গতির প্রবহমানতায় সমস্ত আবর্জনা সরিয়ে দেয়। বিশ্বজগৎ প্রবহমানতার জন্যই নির্মল ও আবর্জনা মুক্ত। কখনোই তা বাধা করা যায় না। এই বিশ্বজগৎ যখন পরিপূর্ণ স্তব্ধতা নিয়ে নিদ্রা। স্থবিরতা ও অজ্ঞান, এই স্থবিরতা আমাদের কুলপ্লাবন সংসারে পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে। সুতরাং স্থবিরতা ও আবর্জনার অপসারণ যদি না ঘটে তাহলে স্থিরশীলতায় পরিণত পারতে। কবি বলেছেন —

"যে মুহূর্তে পূর্ণ তুমি সে মুহূর্তে কিছু তব নাই,
তাই তুমি
পবিত্র সদাই",

▢ কবিতার দ্বিতীয় পর্বে বিশ্ব-প্রবাহের সঙ্গে কবিআত্মার চঞ্চলতার কথা ফুটে উঠেছে। যা কবি নাড়ীতে নাড়ীতে অনুভব করতে পারেন। বিশ্বগতি কবিমনে যে স্পন্দন সৃষ্টি করেছে, তার ফলেই কবি যাত্রা কোলাহল পেছনে ফেলে সামনের দিকে চলেছে। দূর হতে দূরে। গান হতে গানে কবিতার শেষে কবি বলেছেন —

"সম্মুখে বাণী
নিক তোরে টানি
মহাস্রোতে
পশ্চাতের কোলাহল হতে
অতল আঁধারে"

‘বলাকা’ কাব্যগ্রন্থের ৩৬-নং কবিতা হল ‘বলাকা’। এটি নাম কবিতা। বলাকা কাব্যের মূলভাবনা হল — গতিবাদ। ‘বলাকা’ কবিতায় কবির উড্ডয়মান হংস বলাকার গতির মধ্যে তার নিহিত, বিশ্বলোকের গতিতত্ত্বকে নিরীক্ষণ করেছেন। কবিতাটি রচনার একটি বিষয় প্রেক্ষাপট আছে, কোনো এক সন্ধ্যায় কবি কাশ্মীরের শ্রীনগরে ঝিলম নদীর ওপর হাউসবোটের উপর কবি বসেছিলেন। চারিদিকে তখন নিস্তব্ধ সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। তখনই সময় সন্ধ্যার নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে একদল হংসবলাকা কবির মাথার উপর দিয়ে আপন মনে উড়ে গেল। তা দেখে কবি প্রাণ শিহরিত হয়ে উঠল। কবির মনে হল — এই হংস বলাকার পাখা যেন পৃথিবীর সমস্ত নিশ্চলের মধ্যে এনে দিল বেগের উন্মাদনা। কবি লিখেছেন:—

“মনে হল, এ পাখার বাণী
আনি দিল
শুধু পলকের তরে
পুলকিত নিশ্চলের অন্তরে অন্তরে
বেগের আবেগ”।

কবির মনে হয়েছে ওই উড্ডীয়মান বলাকাশ্রেণী যেন পৃথিবীর সমস্ত নিশ্চল পদার্থের মধ্যে বেগের আবেগ এনে দিয়েছে। তাই পর্বত যেন বৈশাখের মেঘের মতোই উড়ে যেতে উদগ্রীব, তরুশ্রেণী যেন মাটির বন্ধন ছেড়ে বলাকার শব্দ অনুসরণ করে দিশেহারা হয়ে আকাশের কোথা প্রান্ত খুঁজে উড়ে যেতে চেয়েছে। বলাকার পাখা যেন সমস্ত তিমির মধ্যে দিয়ে গতি সঞ্চার করেছে। এনেছে সুদূরের আহ্বান:—

“ধ্বনিল ব্যাকুল বাণী নিখিলের প্রাণে
হেথা নয়, হোথা নয়, অন্যকোন খানে”।

হংসবলাকা যেন ঘুচিয়ে দিয়েছে কবির অন্তরের স্তব্ধতা। কবি এই অনুভব করেছেন, জলে স্থলে বলাকার পাখার মতোই উদ্দামতা, চঞ্চলতা, মাটির নীচে লুকিয়ে থাকা সুপ্ত বীজগুলি ও বলাকার মতোই অঙ্কুরে, ডানা মেলতে শুরু করেছে। দ্বীপ হতে দ্বীপান্তরে, কবির আপন অন্তরে এই নিরুদ্দেশের গতিময়তাকে ও অনুভব করেছেন যথা —

"শুনিলাম মানবের কত বাণী দলে দলে
অলক্ষিত পথে উড়ে চলে"
অস্পষ্ট অতীত হতে 'অস্ফুট সুদূর যুগান্তরে"।

আলোচ্য 'বলাকা' কবিতায় কবি বলাকার মতোই বিশ্বের সমস্ত কিছুর মধ্যে অফুরন্ত গতিশক্তি অনুভব করেছেন। সমস্ত ক্ষুদ্রতা মুক্ত হতে চেয়েছে। বিশ্বের কোনোকিছু-ই থেমে থাকে না। থেমে থাকতে চায়ও না। এক স্থান থেকে অন্যস্থানে, এক অবস্থা থেকে অন্য নিয়ত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। এই পরিবর্তন-ও বিবর্তনের সূত্র দিয়ে বলাকা কাব্যের বিভিন্ন কবিতায় ফুটে উঠেছে।

'বলাকা' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতা হিসাবে কবিতাটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। 'বলাকা' কথার অর্থ হল — উড্ডীয়মান বকের সারি। গতিময়তাই যার মূল বৈশিষ্ট্য। এ কাব্যে সেই গতিবাদের কথাই ধ্বনিত হয়েছে বিভিন্ন কবিতায়।

(ঘ)

রবীন্দ্র কাব্যধারায় উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল – "বলাকা"। এই কাব্যগ্রন্থে মোট কবিতার সংখ্যা হল ৪৫। ১৩২১ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস থেকে ১৩২৩ বঙ্গাব্দের বৈশাখ মাস পর্যন্ত রবীন্দ্রনাথ যখন বিভিন্ন স্থানে ভ্রমণ করেছিলেন, তখন "বলাকা"র কবিতাগুলি রচনা করেন। "বলাকা" কাব্যগ্রন্থের প্রথম কবিতা হল – "সবুজের অভিযান"।

☐ কবিতাটি দুরন্ত প্রাণশক্তির প্রতীক। নবীন যৌবনের প্রতীক। এই যৌবনের ধর্মই হল – সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, প্রতিবন্ধকতা ও কুসংস্কারকে হেলায় তুচ্ছ করে সামনের দিকে এগিয়ে চলা। এই নবীনেরা কোনো শাস্ত্র বিধি বিধান মানে না। কবি সেই অবুঝ নবীনদের সাথে আহ্বান জানিয়েছেন যারা প্রাচীন সংস্কারের গণ্ডিতে আবদ্ধ এবং অর্ধমৃত, নবীনেরা তাদের ঘা মেরে, অর্থাৎ জোর ঝাঁকুনির দ্বারা সজাগ করে তুলবে। তাই কবি বলেছেন—

"ওরে নবীন, ওরে আমার কাঁচা
ওরে সবুজ ওরে অবুঝ
আধ-মরাদের ঘা মেরে তুই বাঁচা"।

☐ এই কবিতায় কবি সেই উদ্দাম যৌবনশক্তিকে, চিরযুবাকে "নবীন", "কাঁচা", "অবুঝ", "জীবন্ত", "অশান্ত", "অন্ধ", "প্রমত্ত", "অমর" প্রভৃতি বিশেষণ দ্বারা চিহ্নিত করেছেন। কবি মনে করেন প্রাচীনপন্থীরা সংস্কারের জালে আবদ্ধ। তাদের প্রাণশক্তির একান্ত অভাব। তবু তারাই আবার নিজেদের পাকা, অভিজ্ঞ বলে দাবি করে। কবি বলেছেন ওরা চোখ কান কুসংস্কারের আবরণে ঢেকে চিত্রপটে আঁকা ছবির মতো অন্ধকারের বদ্ধ খাঁচায় বসে ঝিমোচ্ছে।

ওদের জীবন্মৃত অবস্থা থেকে উদ্ধারের জন্য কবি নবীনদের আহ্বান জানিয়েছেন।

"চক্ষু কর্ণ দুইটি ডানায় ঢাকা,
ঝিমোয় যেন চিত্রপটে আঁকা।
অন্ধকারে বন্ধ করা খাঁচা।
আয় জীবন্ত আয়রে আমার কাঁচা"।

কবির বিশ্বাস, ঝড়ের মতো প্রচণ্ড উন্মাদনায় যৌবনশক্তি যখন এগিয়ে আসবে। তখন প্রাচীন পন্থীদের সমস্ত ভুলগুলো ভেঙে যাবে।

☐ এই কবিতায় কবি নবীনদের প্রাণের উন্মত্ত তা স্বাগত জানিয়েছেন। এরা ভুল-ভ্রান্তির মধ্য দিয়ে ঝড়ের গতিতে এগিয়ে এসে সমস্ত প্রাচীন প্রতিবন্ধকতা কে এক মুহূর্তে ভেঙে চুরমার করে দেবে। এরা সর্বদাই আত্মশক্তিতে নির্ভর করে জানা থেকে অজানার দেশে পাড়ি দেয়। পুঁথিগত বিদ্যার ওপর নবীনেরা কখনোই নির্ভর করে না। বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়ে নবীনেরা সৃষ্টির উন্মাদনায় মত্ত থাকে।

☐ কবিতার শেষের স্তবকে কবি নবীনদের 'চিরযুবা', 'চিরজীবী' বলে সম্বোধন করেছেন। তিনি নবীনদের মধ্যে রয়েছে চিরযৌবন যা জরার জীর্ণতাকে মুছে ফেলে অফুরন্ত প্রাণশক্তি ছড়িয়ে দেবে।

"চিরযুবা তুই যে চিরজীবী
জীর্ণ জরা ঝরিয়ে দিয়ে
প্রাণ অফুরান ছড়িয়ে দেদার দিবি"।

কবিতাটিতে আবেগের প্রাচুর্য বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে। সমগ্র কবিতার মধ্যে যৌবনের প্রমত্ত বেগ সঞ্চারিত হয়েছে। ফলে, কবিতার মধ্যে একটা উন্মত্ততা এবং উন্মাদনার সুর ধ্বনিত হয়েছে। এই কবিতায় কবি স্থিতিশীলতার পরিবর্তে গতিশীলতাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। এগিয়ে চলাই হল জীবনের ধর্ম। নবীনদের শক্তিতে সে কথাই আলোচ্য কবিতায় প্রতিপাদিত হয়েছে।

'ঝড়ের খেয়া' কবিতাটি সর্বপ্রথম প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় রচিত। বিশ্বব্যাপী যুদ্ধে মৃত্যুর কলরোল শোনা যাচ্ছে দূর থেকে। আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হচ্ছে মৃত্যুর তীব্র আর্তনাদ যা বিশ্ববাসীকে আতঙ্কিত করে তুলছে। যুদ্ধ অনেক দূরে সংঘটিত হচ্ছে বলে ভারতীয়দের চুপ করে উদাসীন ভাবে বসে থাকা চলবে না। সকলকে জীর্ণ প্রথাবদ্ধ জীবন পরিত্যাগ করে যুদ্ধের জন্য আহ্বানে অগ্রসর হয়ে নতুন জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হতে হবে। সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হবে মানুষকে নতুন জীবনের জন্য। কবি বলেছেন—

"তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি।"

এই যুদ্ধের জন্য সকলেই দায়ী। ভীরুর ভীরুতা, উদ্ধত প্রবলের অন্যায় অত্যাচার, লোভীর লোভ, বঞ্চিতের বেদনা, পুঞ্জীভূত হয়ে পৃথিবীতে তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রতিবিধানের জন্য প্রয়োজন সত্য নিষ্ঠা সাধনা। মায়ের অশ্রু, প্রিয়ার ব্যাকুলতা, গৃহের আরাম সবকিছু উপেক্ষা করে ভয় ত্যাগ করলে জন্য প্রস্তুত হলে-ই কল্যাণ ও শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব হবে।

বিপদ সংকুল পরিবেশের মধ্য দিয়ে, সমস্ত প্রতিবন্ধকতাকে অতিক্রম করে এগিয়ে চলার নামই হল -- "ঝড়ের খেয়া"। থেমে থাকা নয়, এগিয়ে চলাই জীবন। ধ্বংসের মধ্য দিয়ে কবি সৃষ্টিকে প্রত্যাশা করেছেন এ কবিতায়, মৃত্যু, ধ্বংস, হত্যা, এ কবিতার শেষ কথা নয়, সত্য শিব সুন্দরের জয়গানই এ কবিতার শেষ কথা।

ব্যক্তি জীবনের সঙ্গে ও এ কবিতায় ব্যাখ্যা করা যেতে পারে। মাঝ সমুদ্রের কান্ডারী যেমন ঝড় - তুফানের সময় জীবনকে উপেক্ষা করে নির্দিষ্ট লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে - তেমনই জীবন সমুদ্রের প্রতিটি মানুষ লক্ষ্যে এগিয়ে চলার জন্য প্রতিনিয়ত সংগ্রাম করে চলেছে। এই সংগ্রামের মধ্য দিয়ে একদিন মানবতারই জয়ধ্বনি ঘোষিত হবে। কবির বিশ্বাস বীরের রক্তস্রোত, মাতার অশ্রুধারা, কখনোই বৃথা হবে না। কবির কঠোর তপস্যায় ধরায় শুভ দিনের সূর্য উদিত হবে। সেইসঙ্গে কবির বিশ্বাস মানুষ মর্ত্যসীমা অতিক্রম করে দেবতার অমর মহিমায় উত্তীর্ণ হবে। কবি তাই শেষে বলেছেন :—

"মানুষ চূর্ণিল যবে নিজ মর্ত্যসীমা
তখন দিবে না দেখা দেবতার অমর মহিমা?"

গীতাঞ্জলির কবি ও ভগবানের মিলন-রহস্যের অনুভূতি ব্যক্ত করেছেন তা আমরা দেখতে পাই কবিতায়। এটা এক নূতন সৃষ্টির সুর বলে মনে হয়। যেথা- গীতাঞ্জলির প্রতীক্ষা ও বিরহের কান্না নেই, গীতিমাল্য ও গীতালির মিলনের আনন্দ ও নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। কবি এখন তাঁকে প্রিয়তমার মতো, সৃষ্টির মধ্যে তার সম্বন্ধের সত্যরূপ দেখতে পেয়েছেন। তাঁর প্রিয়তম যে তাঁর একান্ত আপনার, কবির মতো কাননিকায় তাঁর স্থান যে তার প্রিয়জনের ঊর্ধ্বে, এই সৃষ্টিলীলায় তিনি যে একটা অপরিহার্য অঙ্গ, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।

'প্রেমের প্রয়োজন' কবিতায় কবি বলেছেন - যতদিন কবি এই ধরণীকে ভালোবাসেনি, ততদিন আকাশ, সূর্য-চন্দ্র-গ্রহ-নক্ষত্রের দীপ জ্বেলে প্রতীক্ষা করেছিল। কখন তার প্রেমের দৃষ্টি দ্বারা তার অন্তরের সত্যকে উপলব্ধি করবে। কবি যখন ধরণীকে ভালোবাসলেন, তখন তাঁর প্রেমের চিরন্তন আনন্দ গ্রহ-নক্ষত্র-তারার আলোয় বিকশিত হয়ে রইল। আকাশ তার সার্থকতা লাভ করল, ধরণী তার পরিপূর্ণতা লাভ করল। তিনি না ভালোবাসলে এ ভুবন আপনার পরিপূর্ণতা লাভ করত না।

'তুমি-আমি' কবিতায় কবি বলেছেন যে, ভগবান কবিকে সৃষ্টি করবার আগে তার নিজের স্বরূপ উপলব্ধি করতে পারেন নি, কবিকে সৃষ্টি করবার মধ্যে ভগবানের সুপ্তি ভেঙে জেগে উঠল। তাঁকে ঘিরে কবির মধ্যে বিশ্বের প্রকাশ হল। আলোর ফুল ফুটে উঠল। পরিতৃপ্ত করে দিয়ে ভগবান তাকে নবরূপে রূপান্তর করে দিয়ে গেলেন। কবিকে পেয়ে তাঁর বুক ভরিয়া উঠল। তাঁকে দেখার জন্য ভগবান সূর্য-তারার আলো জ্বাললেন। কবির জন্যই বিশ্ব সত্য হয়ে উঠল। দ্বৈতের মধ্য দিয়ে অদ্বৈতের লীলা সার্থক হল। সীমার মধ্য দিয়ে অসীমের আত্মোপলব্ধি হল।

যে দিন তুমি আপনি ছিলে একা
আপনাকে হয়নি তোমার দেখা
....
আমি এলেম, ভাঙল তোমার ঘুম,
শূন্যে শূন্যে ফুটল আলোর আনন্দ কুসুম।
আমায় তুমি ফুলে ফুলে
ফুটিয়ে তুলে
দুলিয়ে দিলে নানা রূপের দোলে।
আমি এলেম, কাঁপল তোমার বুক,
আমি এলেম, এল তোমার দুখ,
আমি এলেম, এল তোমার আগুন ভরা আনন্দ।
জীবন - মরণ - তুফান - তোলা ব্যাকুল বসন্ত।
আমি এলেম, তাই তো তুমি এলে,
আমার মুখে চেয়ে
আমার পরশ পেয়ে
আপন পরশ পেলে।

এটি মানুষ – ভগবানের লীলার চমৎকার রূপ। কবি 'বলাকায়' লীলাতত্ত্বের শেষ উপলব্ধিতে পৌঁছেছেন।

□ মুক্তক ছন্দ :-

প্রবীণত অক্ষরবৃত্ত রীতিতে রচিত, অনিয়মিত ও অসম দৈর্ঘ্যের পঙ্‌ক্তি সম্বলিত চরণান্তিক মিলযুক্ত, রবীন্দ্রসৃষ্ট যে ছন্দ - বস্তু ভাবটি পঙ্‌ক্তির পর পঙ্‌ক্তিতে স্বচ্ছন্দে প্রবাহিত হয় তাকে 'মুক্তকছন্দ' বা 'মুক্তবন্ধ ছন্দবন্ধ'

□ 'মুক্তক' ছন্দের বৈশিষ্ট্য :-

i) 'মুক্তবন্ধ' বা 'মুক্তকের' পঙ্‌ক্তি বা চরণের পর্বগুলি অসম মাত্রার হয়

ii) 'মুক্তক' ছন্দে পঙ্‌ক্তি - প্রান্তিক মিলাক্ষর আছে।

iii) রবীন্দ্রনাথের 'মুক্তক' গুলি প্রবীণত অক্ষরবৃত্ত রীতিতে রচিত।

iv) অক্ষরবৃত্ত ছন্দের 'মুক্তক' গুলি মাত্রা গণনা পদ্ধতি হল - সমস্ত মুক্ত অক্ষর, এবং শব্দের আদি এবং মধ্যস্থিত রুদ্ধ অক্ষর - ১ মাত্রা, এবং রুদ্ধ বা শব্দের শেষে রুদ্ধ অক্ষর - 2 মাত্রা

□ রবীন্দ্রনাথের 'বলাকায়' মুক্তক ছন্দের প্রসঙ্গ :-

রবীন্দ্রনাথের বলাকার ছন্দকে ছন্দাচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন 'মুক্তক' নাম দিয়েছেন। এই নামকরণের প্রস্তাব রবীন্দ্রনাথের আপত্তি ছিল না। 'মুক্তক' শব্দের অর্থ হল - যে ছন্দ প্রচলিত নানা ধরনের ছন্দের নির্দিষ্ট বন্ধন থেকে মুক্ত। 'বলাকা' কাব্যে আছে সনাতন বাংলা ছন্দে এমন কি মধুসূদনের অমিত্রাক্ষরেও চরণের দৈর্ঘ্য ছিল ৮ + ৬ = ১৪ মাত্রায়। কিন্তু মুক্তক ছন্দের কবিতায় রবীন্দ্রনাথ তা অস্বীকার করে তাঁর খুশিমতো চরণ সৃষ্টি করেছেন।

মুক্তকের চরণ ২ মাত্রার। বৃহত্তম পঙ্‌ক্তি ১৮ মাত্রার। দু-এক স্থানে ২২ মাত্রার পঙ্‌ক্তিও আছে। অবশ্য এই ছন্দের পঙ্‌ক্তি মাত্রেই চরণ নয়। এইরকম পঙ্‌ক্তি সন্ধান রবীন্দ্রনাথের 'মানসী'র নিষ্ফল কামনায় দেখা গিয়েছিল।

ii) মুক্তবন্ধ বা মুক্তকের পঙ্‌ক্তি বা চরণের পর্বগুলি অসম মাত্রার, সব সময় সম পর্বের মাত্রা ২,৪,৬,৮,১০, হয়। মুক্তকের পর্বের মাত্রাসংখ্যা সব সময়ে জোড় মাত্রার হয়, কখনোই বিজোড় মাত্রার দেখা যায় না।

iii) ভাবের স্বচ্ছন্দ প্রবহমানতা 'মুক্তক' ছন্দে দেখা যায়। এখানে যতি ছেদ বা পর্বচ্ছেদ কতমাত্রার পরে পরে পড়বে তার কোনো নিয়ম নেই। তবে এই স্বাধীনতার জন্যই তারটি সকাব্যিক পঙ্‌ক্তিতে যেমনতো প্রবাহিত হয়েছে। অবশ্য এই প্রবহমানতা মধুসূদনের সৃষ্টি; তবে মুক্তকে প্রবহমানতা মধুসূদনের অমিত্রাক্ষর এর থেকেও বেশি যেমন:—

এ জীবনে
আমার ভুবনে
কত সত্য দিলে
মোর চক্ষে এ নিখিলে
দিকে দিকে ~~তুমি~~ -ই লিখিলে
রূপের তুলিকা ধরি রসের মূরতি।

iv) 'মুক্তক' পঙ্‌ক্তি - প্রান্তিক মিত্রাক্ষর আছে তবে, তা নতুন; উদাহরণগুলি তার প্রমাণ 'বলাকার' সকল মুক্তক-ই মিত্রাক্ষর যুক্ত। অবশ্য অন্যত্র 'অমিত্র মুক্তক' ও আছে। যেমন — 'পুনশ্চ' প্রভৃতি।

'বলাকার' 'ছবি', 'শাজাহান', 'চঞ্চলা', 'উদ্যম' 'বিচার' প্রভৃতি কবিতাগুলিতে মুক্তক ছন্দের প্রয়োগ দেখা যায়।

সিদ্ধান্ত

দীর্ঘ আলোচনার পর আমরা দেখলাম যে, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখযোগ্য কাব্য - 'বলাকা', 'বলাকা' কাব্যটি বিশ্লেষণ করলে এর কবিতাগুলি নিজ আমাদের চোখে পড়ে - যেমন "বলাকা" কাব্যের মূলত প্রতিবাদের কথাতে তুলে ধরা হয়েছে বিভিন্ন কবিতার মধ্য দিয়ে। যেমন:- 'সবুজের অভিযান' কবিতায় নবীনদের এগিয়ে চলার আহ্বান জানিয়েছেন। সমস্ত বাধা-বিঘ্ন, কুসংস্কার ও প্রতিবন্ধকতা ভেঙে সম্মুখ পানে এগিয়ে চলার কথা বলেছেন। "ছবি" কবিতায় ছবিকে আমরা হয়তো স্থির বলে মনে হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা স্থির নয়, বরং কবি এই ছবির মধ্যে কবি গতির সঞ্চার করেছেন, যার এই ছবি কবির চিন্তা চেতনাকে সুদূরপ্রসারী করে তুলেছে, এই ভাবেই গতির কথা প্রকাশ পেয়েছে "বলাকা" কাব্যে বিভিন্ন কবিতায়।

গ্রন্থপঞ্জী

i) রবীন্দ্রনাথের বলাকা → ড. সুজন্তু বসু

প্রকাশক → ৫৩/১৭, পটুয়াটোলা লেন, কলকাতা-৭০০-০০৯

প্রথম মুদ্রণ → জানুয়ারি, ২০২৬

ii) রবীন্দ্র সাহিত্যের ভূমিকা → নীহাররঞ্জন রায়.

প্রকাশক → নিউ এজ পাবলিশার্স

কলকাতা → ৭০০০০৯

প্রথম মুদ্রণ → ২৫ বৈশাখ ১৪৯৬

iii) রবীন্দ্র-কাব্য-পরিক্রমা → উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য

প্রকাশক → ওরিয়েন্ট বুক কোম্পানি

৯ শ্যামাচরণ দে স্ট্রিট

কলকাতা – ৭০০০৭৩

একাদশ সংস্করণ : 22 শে শ্রাবণ ১৪22.

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

আমার এই প্রকল্পমূলক কাজটি সম্পন্ন করতে গিয়ে যে সব ব্যক্তি সহযোগিতা ও পরামর্শের হাত বাড়িয়ে দিয়েছে তাদের সবার প্রতি আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কৃতজ্ঞতা জানাই সেই সমস্ত গ্রন্থাগারকে যেখান থেকে প্রাপ্ত বিভিন্ন গ্রন্থ ও নথিপত্র আমার প্রকল্প রচনার জন্য সাহায্য করেছে। এছাড়াও স্বর্ণময়ী যোগেন্দ্রনাথ মহাবিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের শুভকামনা।

শ্রাবনী দানা
- - - - - - - - -
শিক্ষার্থীর স্বাক্ষর

EXAMINED
[illegible] 2/9/23
(Examined)
- - - - - - - - -
শিক্ষক/শিক্ষিকার স্বাক্ষর

Department of Bengali
S.J. Mahavidyalaya